অনীক

জুলাই ২০১১

বর্ষ ৪৮ ❑ সংখ্যা ১

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

জিতেন মারান্ডিদের ফাঁসির... ❑ প্রণব দে ❑ ২

প্রবন্ধ

বন্দীমুক্তি আন্দোলন ❑ দীপংকর চক্রবর্তী ❑ ৩

ভারতে বামপন্থার ভবিষ্যৎ ❑সুমন্ত ব্যানার্জী❑২১

সম্মানের সঙ্গে উন্নয়ন ❑ ১৩

খাদ্য সংকট

বিশ্বজোড়া খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও খাদ্য সংকট ❑ অপরাজিতা মুখার্জী ❑ ২৫

খাদ্য নিরাপত্তা ও দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার ❑ রতন খাসনবিশ ❑ ৩০

পঃবঙ্গে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ❑ পার্থ সারথি q ৩৬

খাদ্য সুরক্ষা ❑ দেবিন্দর শর্মা ❑ ৩৬

পাঠকের কলমে

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এবং জনমতের প্রতিফলন ❑ ৩৮

ফিরে দেখা

ফিরে দেখা : প্যাট্রিস লুমুম্বা ❑ ৩৮

বাঁকা চোখে

কৃচ্ছ্রসাধন শুধু গরীবদের জন্য? ❑ ৪০

কবিতা

একুশ শতকের 'প্রশ্ন' ❑ রাজেশ দত্ত ❑ ৪০

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :

প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৮৭৭৫৬০

গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek64@gmail.com

ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯

(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

ভারতে রাষ্ট্রীয় দড়ির খেলা

এককালে সারা পৃথিবীতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল ভারতীয় সার্কাসের ভারসাম্যের দড়ির খেলা। কীভাবে দড়ির উপর দিয়ে ভারসাম্য রেখে হাঁটতে হয় সেটা দেখিয়ে আমাদের পারদর্শী খেলোয়াড়েরা সবাইকে চমকে দিতেন। আজও কিন্তু সেই পারদর্শিতা তারা হারিয়ে ফেলেন নি, বরং আরও বৃহত্তর পরিসরে— রাষ্ট্রীয় স্তরে তার অনুশীলন করে চলেছেন।

না হলে ভেবে দেখুন, সেই কবে ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত রাষ্ট্রীয় দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন পরিচালনা ও বিচার— রাষ্ট্রের এই তিনটি স্বতন্ত্র শাখার স্বাতন্ত্র্য এবং একই সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে সমন্বয়ের লক্ষ্যে 'ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব' হাজির করেছিলেন; ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা ভারতীয়রা সেটা লুফে নিয়েছি এবং সযত্নে তার অনুশীলন করে চলেছি। মাঝে মাঝে এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব ভিত্তিক পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থার উপর যে আক্রমণ আসে নি তা নয়। ১৯৭৫-এ ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা তার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ব্যতিক্রমী প্রবণতা মূলত পিছু হটেছে, আবার রাষ্ট্রের তিনটি শাখার স্বাতন্ত্র্যের মডেলটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সম্প্রতিকালে আবার নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক পন্থার স্বার্থে বহু ক্ষেত্রে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে প্রশাসনিক শাখা তথা শাসক দলগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের একটি প্রবণতা ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি প্রধান শাসক দলগুলি তো বটেই, এমনকি বিএসপি-এসএসপি-ডিএমকে-এআইডিএমকে-রাষ্ট্রীয় জনতা-তৃণমূল প্রভৃতি আঞ্চলিক দলগুলি তো বটেই, এমনকি সিপিআই(এম)-জাতীয় সংসদীয় বাম দলগুলিও তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে ও করছে। ফলত বিপন্ন সেই সমন্বয়ের মডেলটিকে আবার নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ছে শাসনব্যবস্থার তৃতীয় শাখাটির— অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থার উপর। ভারসাম্য-বিরোধিতা ও ভারসাম্য-পুনঃসংস্থাপনের দুই বিপরীত প্রবণতার এই দ্বন্দ্বটিরই প্রতিফলন ধরা পড়ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের 'অতি-সক্রিয়তা' হিসেবে প্রায়শ অভিহিত কার্যকলাপের মধ্যে। টু-জি স্পেকট্রাম কেলেংকারি, ভিজিল্যান্স কমিশনার নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক, ছত্তিশগড়ের সালোয়া জুড়ুম, উত্তরপ্রদেশের নয়দা'র জমির লড়াই প্রভৃতি প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু রায় অনেক ক্ষেত্রে শাসক-শোষকশ্রেণীর বদলে শোষিতদের বেশি খুশি করলেও তাতে খুব উল্লসিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সমন্বয়ে মডেলটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তার মূল লক্ষ্য। ফলত সেগুলি শোষক-শাসকদের আংশিক আপাত-অসুবিধে করলেও, শেষ বিচারে, এই বুর্জোয়া সমাজ ও শাসনব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে এনে তাদের মৌলিক তথা দীর্ঘায়ত স্বার্থই পূর্ণ করছে।

এই সংখ্যায় অনীক আটচল্লিশ বছরে পা দিচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত লেখক, গ্রাহক, পাঠক, সহযোগী ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

জিতেন মারান্ডিদের ফাঁসির আদেশ রদ করতে হবে

বিনায়ক সেনের বিচার প্রহসন এখনও স্মৃতিতে মলিন হয়ে যায় নি। সেটা ছিল ছত্তিশগড়ের ঘটনা। শুধুমাত্র জনৈক ব্যক্তির বিবৃতির ভিত্তিতে, রায়পুর আদালতের বিচারক মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কাল্পনিক অভিযোগে এক সমাজসেবী ডাক্তারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে দিলেন। নিষিদ্ধ হলেও কোন সংগঠনের সঙ্গে নিছক যোগাযোগ যে অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে না, এটা সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায়ে জানিয়েছে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হতেই পারে, উচ্চতম আদালতের রায় সম্ভবত ভারতের নিম্নতর আদালতগুলিতে পৌঁছয় না অথবা ভারতের নিম্ন আদালতগুলি উচ্চতম আদালতের নির্দেশকে ধর্তব্য বলে গণ্য করে না। উপরন্তু, বিবৃতি বা অভিযোগের সত্যাসত্য বিচারের প্রয়োজনীয়তাটুকুও বিচারকরা অনুভব করেন না।

এটাকে বিচার বলা সঙ্গত নয়। তবুও সেই অবিচারের পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদালতে। গত ২৩ জুন ২০১১, ঝাড়খন্ডের গিরিডি আদালতে জনপ্রিয় প্রতিবাদী শিল্পী-গায়ক জিতেন মারান্ডি সহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কেন? তাঁরা নাকি ২০০৭ সালের চিলকারি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'নাকি' বলছি এই কারণে, এই অভিযোগের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কোনও একজনের বিবৃতির ওপর নির্ভর করেই এই ভয়ঙ্কর বিচারাদেশ দেওয়া হয়েছে।

২০০৭-এর ২৬ অক্টোবর গিরিডি জেলার দেওরি থানা এলাকায় চিলিকারি অঞ্চলে নারী-পুরুষ-শিশু সহ ২০ জন মানুষকে নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডির পুত্র অনুপও এই ঘটনায় নিহত হয়। পুলিশের অভিযোগ, উগ্রপন্থী মাওবাদীরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। পুলিশের অভিযোগ অমূলক নাও হতে পারে। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জিতেনদের জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে পুলিশের কল্পনাপ্রসূত। জিতেন মারান্ডিকে বলা হয় ঝাড়খন্ডের গদর। আদিবাসী-শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী তাঁর গানে মূর্ত হয়ে ওঠে। অর্থনীতির উদারীকরণের ফলশ্রুতিতে কর্পোরেট পুঁজি যেভাবে ঝাড়খন্ডে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে লুঠ করে চলেছে, সাধারণ আদিবাসী মানুষদের উচ্ছেদ করে চলেছে, জিতেনের গানে তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হত। মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করত জিতেনের গান। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে জিতেন অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু বৃহৎ কোম্পানি এবং সরকারের চক্ষুশূলে পরিণত হয়।

২০০৮-এর ৫ এপ্রিল, ঝাড়খন্ড পুলিশ জিতেন মারান্ডিকে গ্রেপ্তার করে। ছয় মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে, আদিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা ও রাস্তা অবরোধ করার অভিযোগে জিতেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্তত পুলিশ জিতেনকে সেটাই জানিয়েছিল। অভিযোগ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যে জামিন পাওয়া যেত না। কিন্তু জিতেনকে রাঁচিতে বীরসা মুণ্ডা জেলে আটক করে রাখা হয়। আসল নাটকটা শুরু হয় এরপর।

চিলকারি ঘটনার পর ঐ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের নিরাপত্তারক্ষী পুরণ কিস্কুর মাধ্যমে থানায় এজাহার করে বলা হলো, জিতেন মারান্ডি ঐদিন চিলিকারিতে উপস্থিত ছিল। 'খবরটি' সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে দেরি হয়নি। সংশ্লিষ্ট হিন্দি দৈনিকের সংবাদের বিরুদ্ধে জিতেন প্রতিবাদ করে জানায় যে, এজাহারে উল্লিখিত 'জিতেন' সে নয়। সে চিলকারিতে আদৌ উপস্থিত ছিল না। সংবাদপত্রটি তাদের ভুল স্বীকার করে নেয়। কিন্তু পুলিশের ভুল হয়নি। তারা তাদের উদ্দিষ্টকে পেয়ে গেছে। অনুসন্ধান করে তারা সময় নষ্ট করতে রাজি হয়নি। জিতেনকে তারা চিলকারি কাণ্ডে অভিযুক্ত করল। এবং এইরকম দুর্বল অভিযোগেও ফাঁসির আদেশ দিতে বিচারক মশাইয়ের হাত কাঁপে নি।

বিনায়ক সেন এবং জিতেন মারান্ডির বিচার থেকে রাষ্ট্রশক্তির এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রতিবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠস্বরকে, বিশেষত তা যদি বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থবিরোধী হয়, তা রুদ্ধ করার জন্য শাসক শ্রেণীর দমননীতি এখন শুধু পুলিশি নিপীড়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে নতুন নতুন দানবীয় আইনের প্রবর্তন ও প্রয়োগ চলছে, অপরদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশের যাবতীয় কুখ্যাত আইনগুলির পুনঃপ্রবর্তনের সাহায্যে বিচার বিভাগকে নির্মম, প্রতিহিংসামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা শুরু হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে রাষ্ট্র-বিরোধী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, মানবাধিকার কর্মীদের বলা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহী। ঔপনিবেশিক ফৌজদারি আইনের ১৬৪ ধারা প্রয়োগ করে, পুলিশ 'আপনজনের' সাহায্যে প্রতিবাদী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটা বিবৃতি লিখিয়ে নিয়ে, সেই বিবৃতি আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে পেশ করছে, চার্জ গঠন করছে। আর আদালতও তার ভিত্তিতে জীবন বিপন্নকারী সব আদেশ দিয়ে চলেছে।

ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ড, ভারতের দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের মাটি সম্পদের বিচারে যতটা ধনী, সেই মাটিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের বিচারে ততটাই গরিব। ভারতের ২৯ শতাংশ কয়লা সঞ্চিত আছে ঝাড়খন্ডের মাটিতে, ছত্তিশগড়ে ১৬ শতাংশ। লৌহ আকরিকের পরিমাণ ঝাড়খন্ডে ১৪ শতাংশ, ছত্তিশগড়ে ১০ শতাংশ। এ ছাড়া ছত্তিশগড়ে আছে টিন (৮৮%), বক্সাইট, লাইমস্টোন এবং হীরের খনি। ঝাড়খন্ডে আছে গ্রানাইট, গ্রাফাইট, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, বক্সাইট, তামা, ফায়ার-ক্লের

এর পর ৩৬ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

প্রবন্ধ

বন্দীমুক্তি আন্দোলন : ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সাম্প্রতিক বিতর্ক

দীপংকর চক্রবর্তী

❑ এক

সেদিন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এপিডিআর-সহ একুশটি গণসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আয়োজিত কনভেনশনটি যখন শুরু হয়েছিল বিপুল ও অনুশ্রী চক্রবর্তীর 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই' গানটি দিয়ে, তখন সমবেত পঞ্চাশোত্তর অনেকেরই স্মৃতির দরজায় ঘা দিয়েছিল ১৯৭৭-এর বন্দীমুক্তির দাবিতে উত্তাল আন্দোলনের ঝিলিক। কেননা এই গানটিই কার্যত ছিল সেদিনের সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের থিম সং। স্বভাবতই অনেকের হাতই যেন অনেক দিন পরে আবার মুষ্টিবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। সেই শক্ত মুঠি কিন্তু প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই প্রায় আলগা হয়ে এসেছিল, যখন তাঁদের চৈতন্যে হঠাৎ আবার ঘা দিয়েছিল এই উপলব্ধি যে, *অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ...* আজকে সেই ঐতিহ্য ও পরম্পরাবাহী আন্দোলনে জন্ম নিয়েছে সংশয় ও বিভ্রান্তি। এই পটভূমিকাটিই আজকে এই আন্দোলনের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে নতুন করে আবার তুলে ধরার আবশ্যিকতাকে জরুরি করে তুলেছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি সারা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমাদের দেশেও এর এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি*-টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বজনীন দাবি। রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে, কিংবা রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে কোনো কাজের জন্য, এমনকি সেটা হিংসাত্মক বা প্রচলিত আইনে 'অপরাধ' বলে গণ্য হলেও, কেউ বন্দী হলে সাধারণভাবে তাঁকে 'রাজনৈতিক বন্দী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তোলা হয়। কোনো দেশের শাসকেরা কোনো দিনই এদেরকে 'রাজনৈতিক বন্দী' বলে গণ্য করতে বা তাদের মুক্তি দিতে চায় না। আইরিশ সশস্ত্র বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলাদের ক্ষেত্রেও এই দাবি নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল। আমাদের দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করেছে। শুধু তাই নয়, তার ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭-পরবর্তী সমস্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারও এই পথই অনুসরণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অধুনা-বাতিল জেলকোডেও সেরকম বিধান ছিল। সম্ভবত একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সত্তরের দশকের রক্তাক্ত ইতিহাসের আপাত-অবসানের পর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য আটক হাজার হাজার বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গড়ে-ওঠা উত্তাল আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আজকের মতোই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসীন বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মেনে নেয়। জেল কোডের পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৯২-এ চালু-হওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্টেও 'রাজনৈতিক বন্দী'-র উপরোক্ত সংজ্ঞা স্বীকৃতি পায়। মনে রাখা দরকার, এটি অর্জিত হয়েছিল মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলেই, কেউ দয়া করে এটা ভিক্ষে দেয়নি।

❑ দুই

আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে ধরা পড়বে, ১৯১৯ সালে মানুষের ব্যাপক দাবির প্রেক্ষিতে মন্টেগু-চেমসফোর্ড চুক্তি অনুসারে, 'ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট' দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার আলিপুর বোমা মামলায় আন্দামানে নির্বাসিত কুখ্যাত সিডিশন অ্যাক্টের ৩এ ধারায় শাস্তিপ্রাপ্ত 'চরমপন্থী' বিপ্লবীদের পর্যন্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। এর পরে ত্রিশের দশকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি আবার বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং ১৯৩১-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত এমন সব বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে সারা দেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এর পরে মূলত কংগ্রেস তথা পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতির উদ্যোগে ১৯৩৬-এ ভারতের প্রথম সংগঠিত মানবাধিকার সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন' গড়ে উঠলে, অন্যান্যদের সাথে সাথে 'হিংসাত্মক' কার্যকলাপের সাথে যুক্ত বন্দীদের মুক্তির দাবিও তোলা হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও একই মর্মে প্রস্তাব নেয় এবং শেষ পর্যন্ত আন্দামানে নির্বাসিত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও মুক্তি পান। ১৯৪৭-পরবর্তীকালে ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর তাদের বহু কর্মী ও সমর্থককে 'হিংসাত্মক কার্যকলাপের' অভিযোগে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। মেঘনাদ সাহা, শরৎচন্দ্র বসু, ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে তাঁদের মুক্তির দাবিতে জনমত ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। সত্তরের দশকে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী নকশাল-পন্থীদের মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করেই মূলত গড়ে ওঠে ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতের প্রথম সংগঠিত ও ধারাবাহিক মানবাধিকার অধিকার সংস্থা 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' (এপিডিআর)। জরুরি অবস্থার সময় এপিডিআর-কে নিষিদ্ধ করা হলেও 'বন্দী মুক্তি ও গণদাবি (প্রস্তুতি) কমিটি'-র পতাকাতলে ব্যাপক বন্দী মুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে, এবং আন্দোলনের চাপে বামফ্রন্ট

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এটা ঘটনা যে, ১৯৭৭-এ বামফ্রন্টের মধ্যেও 'রাজনৈতিক' বন্দী কাকে বলা হবে, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। আগেই বলেছি, সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত তখনও চালু রাজ্য জেল কোড অনুসারে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কেউ, রাজনৈতিক কাজের অঙ্গ হিসেবে তা করা হলেও, 'রাজনৈতিক' বন্দী হিসেবে স্বীকৃতি পেতো না। আর মানবাধিকার কর্মীদের দাবি ছিল : হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাক বা না থাক, সেটা মূল বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। তাহলে তো ক্ষুদিরাম-কানাই-দীনেশ থেকে শুরু করে সূর্য সেন বা ভগৎ সিং প্রভৃতি সশস্ত্র পথযাত্রী বিপ্লবীরা কেউ 'রাজনৈতিক' বলে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য হতেন না! সশস্ত্র পথযাত্রীদের 'রাজনৈতিক বন্দী' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে নকশালপন্থীরাও ছাড়া পেয়ে যাবে— এই অজুহাতে সিপিআই(এম) নেতৃত্বের একাংশও কার্যত এই বক্তব্যের বিরোধিতা করতে চাইছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি সেই বক্তব্যের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন (দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিভূষণ মন্ডল প্রভৃতি তো এমনকি এপিডিআর, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি-র সদস্য ছিলেন)। সিপিআই(এম) নেতৃত্বের একাংশও তাঁদের সমর্থন করেছিলেন। সে-সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুপরিচিত অশোক মিত্রের একটি নিবন্ধও (*'আমাদের সন্তান-সন্ততিরা'*— মে ২০১১ সংখ্যা *অনীক*-এ পুনঃপ্রকাশিত) মানবাধিকার আন্দোলনের দাবির পক্ষে বিপুল জনমত তৈরি করতে ভূমিকা নিয়েছিল। সুশোভন সরকার, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ সামনের সারির অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা, আজকের মতোই, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির সমর্থনে সোচ্চার হন (বন্দীমুক্তি আন্দোলনের এই মূল দাবির ধারাবাহিকতা বক্সে-র মধ্যেকার এই দুই সময়ের দুটি আবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে)। ফলত শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭-এ বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি*-টি অন্তর্ভুক্ত হয়। বামফ্রন্ট আমলেই তারাপদ চক্রবর্তী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নতুন *ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট* গৃহীত হয়, এবং তার ২৪ নং ধারায় এই বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাক বা না থাক, রাজনৈতিক লক্ষ্যে সাধিত যে কোনো আইপিসি অনুসারে শাস্তিযোগ্য বন্দীকেও 'রাজনৈতিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনলেও, অন্তত ১৯৭৭-এ তারা প্রশংসনীয়ভাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির প্রতিশ্রুতি পালন

রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলন : পরম্পরা

বিবৃতি : ১৯৭৭

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, সারা দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক জনমত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় স্তরে অবিলম্বে জরুরি অবস্থার আগে বা পরে কারারুদ্ধ *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি*-সহ কয়েকটি দাবির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।... জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে স্থিতিশীল প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে— তাঁরা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে থাকুন বা না থাকুন বা সমর্থক হোন— এই দাবিগুলিকে সমর্থন করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায়, সুশোভন সরকার, সমর সেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মৃণাল সেন, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় ঘোষ, বরুণ দে, অশোক মিত্র, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সতীন চক্রবর্তী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,দেবকুমার বসু, অজিত নারায়ণ বসু, বেলা দত্ত গুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় দু'শো জন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী।

তথ্যসূত্র : *Frontier*: ১৯ *ফেব্রুয়ারি*, ১৯৭৭

একটি আবেদন : ২০১১

যাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে সক্রিয়তার কারণে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে পূর্ববর্তী জমানা থেকে আটক রয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁদের *সবাইকে অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি দেবার জন্য* আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

অশোক মিত্র, মৃণাল সেন, সুকুমারী ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, তরুণ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন, কবীর সুমন, কৌশিক সেন, অমর মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপংকর চক্রবর্তী, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য, সন্তোষ রাণা, সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস জোয়ারদার, নব দত্ত, শতরূপা সান্যাল, সব্যসাচী দেব, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র-নারায়ণ মজুমদার, নব দত্ত, প্রদীপ বসু, মৈনাক বিশ্বাস, প্রণব দে, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ নস্কর, অমিত ভট্টাচার্য, কুণাল চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন দত্ত, বিপুল চক্রবর্তী, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, রুশতী সেন, অমিতদ্যুতি কুমার, কুমার রানা, প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত পান্ডা, তাপস চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ গুহ রায়, দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রণেশ রায়, সঞ্জীব আচার্য, সুমিত চৌধুরী, ভাস্কর গুপ্ত, শুচিব্রত সেন, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, অনুশ্রী চক্রবর্তী, বাসুদেব ঘটক, অরূপ দাশগুপ্ত, অমিত চক্রবর্তী, সোমা মারিক, প্রসিত দাস, অনুপম বসু, কৌশিক গুহ

❑ জুলাই : ২০১১

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

করেছিল। অবশ্য আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা সহ বিভিন্ন কারণে সমস্ত বন্দীর মুক্তি বিলম্বিত হয়েছিল, প্রায় দেড় বছর সময় লেগেছিল সমস্ত বন্দীর মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে। তাছাড়া সেই সুযোগে অবাঞ্ছিত কিছু কুখ্যাত সমাজবিরোধীও কংগ্রেস-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তকমায় মুক্তি পেয়ে গেছিল। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রকৃত রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখা হয় নি। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলনেরও দীর্ঘ দিনের ঘোষিত অবস্থান হচ্ছে : কোনো অপরাধী নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে— এই অজুহাতে একজনও নিরপরাধ ব্যক্তির যেন শাস্তি বা বন্দীদশা দীর্ঘায়ত না হয়।

❑ তিন

এবারের রাজ্য নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ যেমন চাইছিলেন, ঠিক সে রকমটাই শেষ পর্যন্ত ঘটেছে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ও মূল— এই দুই কংগ্রেসের জোট এই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে। যে বিপুল ব্যবধানে তারা জয়ী হয়েছেন, স্বভাবতই তার মধ্যে দিয়ে নতুন সরকারের প্রতি ব্যাপক মানুষদের বিরাট প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাশা পূরণের কিছু সম্ভাবনা এবং উদ্যোগ গ্রহণে গতিশীলতার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। কিন্তু যে ক'টি ক্ষেত্রে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাথমিক পদক্ষেপ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে এখনও মূলত ব্যর্থতার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তার একটি হলো রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি তুলেছিল এবং 'বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ' করার বললেও, সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন-দের মুক্তি সম্পর্কে নীরব ছিল। তাছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে মনোনীত রিভিউ কমিটির মাধ্যমে বন্দীদের কেসগুলির পর্যালোচনার ভিত্তিতে 'পদক্ষেপ নেবার' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই এই রাজ্যে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে পূর্ব-আলোচিত ঐতিহ্য ও চেতনার পটভূমিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বদলে বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির, বা মনোনীত কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কেবল বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে পদক্ষেপ নেবার প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে আগে থেকেই সমালোচনা উঠেছিল।

প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতির পটভূমিকাটি একটু দেখে নিলেই এই সমালোচনার উৎস ও কারণ অনেকটাই ধরা পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ থেকে ২০১১-র এপ্রিল পর্যন্ত একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় আন্দোলন। কৃষক ও আদিবাসীদের সেই সব লড়াই সাড়া তুলছে নাগরিক সমাজেও। বামফ্রন্ট জমানার ক্রমব্যাপ্ত সিপিআই(এম) পার্টিতন্ত্র তথা ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয়/দলীয় সন্ত্রাসের দাপটে কুঁকড়ে-থাকা ব্যাপক মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, শপথ নিয়েছেন— সেই শাসনের অবসান ঘটাবার লক্ষ্যে। অজস্র স্লোগানের সঙ্গে মিশে গেছে সেই ঐতিহ্যবাহী স্লোগান: *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই*। এ বছর ২৯ মার্চ মহাবোধি সোসাইটি হলে এপিডিআর-এর উদ্যোগে এই দাবিকে সোচ্চার করে তোলার জন্য কনভেনশন আয়োজিত হলো। সেই কনভেনশনে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ পার্টির প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও, সিপিআই(এম), তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি কোনো প্রধান দলই এলো না। বন্দীমুক্তি প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের বর্তমান স্বৈরতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপের নিন্দার সাথে সাথে তৃণমূল কংগ্রেসেরও সুনির্দিষ্টভাবে সেখানে সমালোচনা করা হলো— সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বদলে রিভিউ কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতির জন্য। তারপর ১৪ এপ্রিল মৌলালি যুবকেন্দ্রে বন্দীমুক্তি কমিটি আয়োজিত কনভেনশনেও সমবেত কণ্ঠে দাবি উঠলো : *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই*। ওই দাবির সমর্থনে সংবাদপত্রে কলাম লিখলেন এই সময়ের বিবেক হিসেবে অভিহিত মহাশ্বেতা দেবী। একই দাবিতে তখন গলা মিলিয়েছেন সবাই— নাগরিক সমাজের কেউই সেই স্লোগানের বিরোধিতা করেন নি।

বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক মানুষের রায়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম)। ২০ মে শপথ নেবে নতুন সরকার। ১৬মে একটি মিছিল আয়োজিত হলো এপিডিআর প্রভৃতির উদ্যোগে। আগেই বলেছি, পরবর্তীকালে যারা পার্টিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে জনগণের ক্রোধ ও বিরোধিতার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, সেই বামফ্রন্টও কিন্তু ১৯৭৭-এ বিপুল জনসমর্থনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল, এবং তাদের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেবার। এবার তাদের স্বৈরতন্ত্রের অবসানে গঠিত নতুন সরকারও যাতে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সেই একই সিদ্ধান্ত নেয়— সেই অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি মহাকরণে জমা দিয়ে আসার জন্যই সেই মিছিল। কী আশ্চর্য! হঠাৎ দেখা গেলো, তাদের সেই মিছিলের বিরোধিতা করতে নেমে পড়েছেন তার মাত্র চার সপ্তাহ আগে পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সোচ্চার কিছু আন্দোলনের সাথী। এসএমএস চালাচালি করে তাঁরা জনে জনে বারণ করলেন, সেই মিছিলে যাতে কেউ যোগ না দেয়। এভাবে অন্তত মূল দাবির প্রশ্নে এতদিনের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তাঁরা নিজেরাই শুধু পাল্টে ফেললেন না— তা তাঁরা পাল্টাতেই

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পারেন— অন্যরাও যাতে পাল্টে ফেলে তার চেষ্টাও শুরু করলেন। বন্দীমুক্তির দাবিতে জনমত তৈরি করার কর্মসূচি নেওয়া দূরের কথা, এই সরকারের প্রতি এই মুহূর্তে সমালোচনা-মূলক কোনো অবস্থান নিতেই তাঁরা কার্যত অস্বীকার করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অতীত ইতিহাস বিকৃত করছেন, আন্দোলন-কারীদের কুৎসা করছেন এবং আন্দোলনের ন্যূনতম যেটুকু কর্মসূচি এখনও পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে, সেগুলি যাতে ব্যর্থ হয়, সেজন্য প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁদের আপত্তি থাকতেই পারে, কিন্তু তাই বলে এভাবে বিকল্প মতের কর্মসূচিকে চক্রান্তমূলক কায়দায় বানচাল করার চেষ্টা কেন? উত্তর মিললো না। তাঁদের মোটামুটি বক্তব্য যা জানা গেলো: তাঁরা এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত এতদিনকার ঐতিহ্য-বিরোধী অবস্থানেরও সমালোচনা করাটা পছন্দ করছেন না, তাদের দেওয়া একান্তভাবেই আংশিক প্রতিশ্রুতিকেই তাঁরা স্বাগত জানিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করতে চাইছেন (*পরিশিষ্ট দেখুন*)। এমনকি বন্দীমুক্তি কমিটিতেও কেউ কেউ এ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, এবং ওই কমিটির সম্পাদকও এই মুহূর্তে সরকার সম্পর্কে কোনো সমালোচনামূলক অবস্থান নিতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে আইনি প্রতিবন্ধকতার ও বাধ্যবাধকতার কথাও তাঁরা তুলছেন (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭-এ আইনি অসুবিধে যতোটা ছিল, তার কিছুটা অপসৃত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ১৯৮০-তে প্রদত্ত একটি রায়ে (*পাশের বক্স দেখুন*)। ৭ জুন এপিডিআর প্রভৃতির উদ্যোগে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আয়োজিত গণঅবস্থানের ক্ষেত্রেও তাঁরা একইরকম বিরোধিতা ও তা বানচাল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এভাবেই শুরু হলো পশ্চিমবঙ্গে ঐক্যবদ্ধতার বিরল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় উজ্জ্বল বন্দীমুক্তি আন্দোলনে বিভাজনের প্রক্রিয়া।

❑ চার

এই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে মানবাধিকার আন্দোলনের মৌলিক একটি নীতিগত প্রশ্ন : বর্তমান শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো সরকার বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলনের বা প্রকৃত অর্থে মানবাধিকার সংগঠনের সম্পর্ক কী হবে? যে কোনো দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক মৌলিক ভিত্তিভূমি হচ্ছে সরকার-নিরপেক্ষতা। কেননা এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে জনমত ও সাধ্যমতো লড়াই গড়ে তোলা। সরকার হচ্ছে সেই রাষ্ট্রেরই বশংবদ চালক। সে কারণেই এই আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ ও কর্মসূচি অবশ্যই গড়ে তোলা দরকার এমনভাবে, যাতে সরকারের বা সরকারি দলের স্বার্থ নয়, মানবাধিকারই সব সময়ে সার্বিক ও সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। তাই মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে সরকারের কোনো পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাতে যেমন দ্বিধা রাখার যুক্তি নেই, ঠিক তেমনি সরকারের কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপকে সমালোচনা করার বা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে নিন্দা করার ও তার বিরুদ্ধে সাধ্যমতো জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নেও কোনোরকম আপসকে প্রশ্রয় দেওয়াটা হবে খুবই গুরুতর বিচ্যুতি।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত শতকের সত্তরের প্রথমে যখন সংগঠিত মানবাধিকার আন্দোলনের অনুশীলন শুরু হয়েছিল, তখন সরকার ও আন্দোলনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত অনুসৃত হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক সময়েই এই আন্দোলন ও সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি লড়াইয়ের একই দিকে থেকেছে। তাই বলে নির্বাচনের সময় মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা বিরোধীদের সাংগঠনিকভাবে সার্বিক সমর্থন জানান নি (একমাত্র কোন দলীয়

মামলা প্রত্যাহার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায়

প্রসঙ্গ: রাজেন্দ্র কুমার জৈন বনাম বিহার রাজ্য

২ মে : ১৯৮০

অনুচ্ছেদ ১৪।। যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবের কারণেই যে শুধু পাবলিক প্রসিকিউটর কর্তৃক অভিযোগ প্রত্যাহৃত হতে পারে তা নয়, এবং এ সম্পর্কে এই আদালতের পূর্ব-নজিরের কথা আমরা আগেই বলেছি। অতীতে আমরা বহু সময়েই দেখেছি যে, গণআন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, আঞ্চলিক বিবাদ, ছাত্রবিক্ষোভ প্রভৃতি কারণে জনস্বার্থেই পাবলিক প্রসিকিউটরের পক্ষে অভিযোগ প্রত্যাহার করাটা যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। যেখানে ভাবাবেগের প্রশ্ন জড়িত এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে হিংসাত্মক প্রবণতার আধিক্য বর্তমান, সেখানে অনেক সময়েই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তব পরিবেশকে হিংসাত্মক প্রবণতার আধিক্য থেকে মুক্ত করে বিবদমান বিষয়-গুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, এবং ঝড়ের পরের শান্ত পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে অভিযোগ প্রত্যাহার করা দরকার হয়ে পড়ে। ভাবাবেগের প্রশ্ন জড়িত থাকার পটভূমিকায় আইনি বিধানের কড়াকড়ির ফল এমনকি হিতে বিপরীত হতে পারে। শুভেচ্ছামূলক একটি পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কিংবা বিরাজমান শান্ত পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত একটি সংবেদনশীল ও জনগণের অনুভূতি ও ভাবাবেগের প্রতি সহানুভূতিশীল সরকার যদি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আর মামলা না করলে বা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া মামলা আর না চালালে সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মামলা করা বা চালানো ক্ষতিকারক না অনুকূল হবে, সরকার ছাড়া কে সেটা সবচেয়ে প্রাথমিকভাবে ঠিক করতে পারে, বা ঠিক করা উচিত! সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, জনস্বার্থেই মামলা প্রত্যাহার করা উচিত, তাহলে কীভাবে তার পক্ষে আর সেটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব?

তথ্যসূত্র: AIR 1980, p.1510 to 1524, (para 14)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ছাপহীন প্রার্থী অশোক মিত্রকে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পক্ষে তাঁর সোচ্চার ইতিবাচক ভূমিকার কারণে এপিডিআর কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কেন্দ্রে সমর্থন জানিয়েছিল), কিংবা ১৯৭৭-এ বিরোধীরা, অর্থাৎ বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতাসীন হলো, রাতারাতি তাদের পক্ষভুক্ত হয়ে যান নি। আন্দোলনের চাপে সেই সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্তকে যেমন তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, ঠিক তেমনি সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও গড়িমসির বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি। আবার সেই সরকারই যখন পরবর্তীকালে স্বৈরতন্ত্রের প্রবণতা দেখাতে এবং মানুষের অধিকারের উপর আক্রমণ শুরু করলো— সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম লড়াইয়ের কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের বা রাজ্যের ব্যাপক নাগরিক সমাজ পথে নামার অনেক আগে— তখনই তাঁরা সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো লড়াই শুরু করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত প্রায় পাঁচ বছরের সারা রাজ্য-জোড়া গণজাগরণের প্রেক্ষিতে সব সময়েই সামনের সারিতে থেকেছেন মানবাধিকার কর্মীরা। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে প্রচারে অংশ নিলেও, সামগ্রিকভাবে মানবাধিকার কর্মীরা মূলত দল-নিরপেক্ষই থেকেছেন। কিন্তু ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হতেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কার্যত তাদের পক্ষে চলে গেছেন (ঠিক যেমন আগের জমানাতেও দেখেছি, বামপন্থার চরম বিরোধী বেশ কিছু লোক প্রায় রাতারাতি 'বাম'-সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন)। আর নির্বাচনে মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল ও মূল কংগ্রেস জোট জয়ী হয়ে সরকার গঠনের পরে তাঁরা এই মুহূর্তে নব-নির্বাচিত সরকারকে 'বিব্রত' করতে তো চাইছেনই না, উপরন্তু যারা সেটা করতে চাইছেন, অগণতান্ত্রিকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে পড়েছেন। ফলত এই রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। মানবাধিকার আন্দোলনের দাবি অনুসারে ১৯৭৭-এর বামফ্রন্ট সরকারের মতো এই নবনির্বাচিত সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে নি। যে বামফ্রন্ট সরকারকে (সঠিকভাবেই) স্বৈরতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করে তাদের সর্বাত্মক বিরোধিতার ফলে আজকের শাসক দলের ক্ষমতায় বসার সুযোগ মিললো, তাদের গৃহীত প্রথম সঠিক ও ইতিবাচক পদক্ষেপটি এই সরকার তো নেয়ই না, তার উপর প্রতিটি বন্দীর মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণভাবে সরকার-মনোনীত একটি রিভিউ কমিটির উপর । তার চেয়েও বড়ো কথা, মুক্তির প্রশ্নেও যে সব বিষয়কে বিবেচনা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলিও এক কথায় অযৌক্তিক ও অপমানজনক। গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে কমিটি দেখবে— বন্দীরা সংশোধনাগারে কীভাবে কাটিয়েছেন! অর্থাৎ স্পষ্টতই এক্ষেত্রে নির্ভর করা হবে স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিগত জমানারই বিশ্বস্ত আমলাদের ও সান্ত্রীদের রিপোর্টের উপর। এখানেই শেষ নয়, বিবেচনা করে দেখা হবে— বন্দীরা মুক্তি পেলে কীভাবে থাকবেন এবং আবার যে 'অশান্তি' পাকিয়ে তুলবেন না— সে সম্পর্কে নিশ্চিতি আছে কিনা। অর্থাৎ কার্যত 'মুচলেকা' দিতে হবে। গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ এই অপমানজনক শর্ত দেখেও নীরব থাকবে? ট্র্যাজেডি এটাই যে, আগেই বলেছি, অধিকাংশ মানবাধিকার কর্মী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির ঐতিহ্যগত দাবির অবস্থানে এবং সরকারের আরোপিত শর্ত-গুলির সমালোচনায় অবিচল থাকলেও, কেউ কেউ বন্দীমুক্তির দাবিতে জনমত তৈরি করার কর্মসূচি নেওয়া দূরের কথা, এই সরকারের প্রতি সমালোচনামূলক কোনো অবস্থান নিতেই অস্বীকার করছেন।

এ প্রসঙ্গে দুটি পূর্ব-দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। জরুরি অবস্থার সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে গঠিত পিইউসিএল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭-এ ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় ও কেন্দ্রে ও অনেকগুলি রাজ্যে জনতা সরকার গঠিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে ছত্তিশগড়ে ১২ জন খনিশ্রমিক এবং কানপুরের স্বদেশি মিলে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হলেও, 'কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনের সুবিধে হয়ে যাবে'— এই অজুহাতে তখন পিইউসিএল-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত তার নিন্দা বা প্রতিবাদ করতে অস্বীকার করেন। আবার ১৯৭৯-তে পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে পুলিশ নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত করলেও পিইউসিএল-এর সভাপতি তারকুন্ডে ওই এই একই অজুহাতে তা নিয়ে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তাতে অংশ নিতে এবং এই চরম মানবাধিকার ভঙ্গের ঘটনার বিরোধিতা বা নিন্দা করতে অস্বীকার করেন। তা নিয়ে দেশ জুড়ে মানবাধিকার কর্মীরা বিতর্ক শুরু করেন। দিল্লীর পিইউসিএল-এ আগে থেকেই কিছু দ্বন্দ্ব ছিল, এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে তাঁরা আলাদা সংগঠন পিইউডিআর গঠন করেন। এবং সারা দেশে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সরকার-নির্ভর বা দল-নির্ভর মানবাধিকার আন্দোলনের ধারণা মানবাধিকারের মৌলিক মতাদর্শের বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার আন্দোলনেও এতোদিন এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য যে, বামফ্রন্ট সরকারের সূচনাপর্বে সরকার এ ব্যাপারে মূলত অভিনন্দনযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সে সময়েও রাজ্যপ্রশাসনের কিছু আমলা, এবং এমনকি তৎকালীন কেন্দ্রীয়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং পর্যন্ত প্রতিটি কেস পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কেবল তাদের মুক্তির কথা বিবেচনা করতে বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তখন তাদের সেই প্রস্তাবকে 'খামোকা টালবাহানার কৌশল' বলে নাকচ করে দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তির উপর গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেন। বস্তুত তবুও বিশেষত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কিছু আমলা বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, এবং সেকারণে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি বিলম্বিত হচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে তখন বহু মিছিল বেরিয়েছিল, কেউ সেই প্রতিবাদী কর্মসূচির প্রকাশ্যে বা গোপনে বিরোধিতা করে নি। সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শরিক দলগুলির নেতারা— দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিভূষণ মন্ডল প্রভৃতি— সরকারে থেকে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দেবার ব্যাপারে তাঁদের 'অসহায়তা'-র কথা বলেছিলেন। সরকার তখন বিষয়টির দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র থেকে নিয়ে আইন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছিল। অন্ধ্রের পার্বতীপুরম ষড়যন্ত্র মামলা এবং বিহারের অনেক মামলায় অনেক জটিলতা থাকা সত্ত্বেও, সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সেগুলির সমাধান করেছিল। তবে চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের (অনন্ত সিং প্রভৃতি) বামফ্রন্ট প্রথমে 'রাজনৈতিক' বন্দী বলে স্বীকার করতে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু জনমত ও আন্দোলনের ফলে তাঁদেরকেও সরকার মুক্তি দেয়। ফলত বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

অন্য দিকে, বর্তমান সরকার একেই আন্দোলনের ঐতিহ্যগত সমস্ত বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মেনে নেয় নি। তার উপর মর্যাদা হানিকর শর্ত আরোপ করলে এবং আমলাতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করলে মানবাধিকার আন্দোলন নীতিগতভাবেই কোনোভাবে তাকে সমর্থন করতে পারে না। মূল প্রশ্নটা এটাই : নিঃশর্ত বন্দীমুক্তি, না শর্তাধীন বন্দীমুক্তি? জনমত গঠন ও প্রয়োজনমতো আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তিকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে কিনা— এটাই এই মুহূর্তে এ রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠন ও কর্মীদের সামনে হয়ে উঠছে একটি অগ্নিপরীক্ষা। অধিকার আন্দোলনের একটি মৌলিক ও প্রধান শ্লোগান হচ্ছে : ভিক্ষে করে বা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে অধিকার অর্জিত হয় না— অর্জিত হয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এই মুহূর্তে আন্দোলনের মধ্যেকার দুঃখজনক বিভাজন নিঃসন্দেহে সে পথে একটি প্রধান বাধা। দীর্ঘ দিন এই আন্দোলনে যাঁরা এক সাথে পথ হেঁটেছেন, অবশ্যই সবিশেষ চেষ্টা চালাতে হবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে তাঁদেরকে আবার যুক্ত করার। কিন্তু তাই বলে সরকারের প্রতি মোহ বা ব্যক্তি-মোহকে প্রশ্রয় দেওয়াটা হবে অনৈতিক— নীতিতে অবিচল থেকেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার, এবং সুনিশ্চিতভাবেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি অর্জন করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সংযোজন ❑ এই নিবন্ধটি শেষ করার সমসময়ে গত ১১ ও ১৪ জুলাই কলকাতায় যথাক্রমে এপিডিআর-সহ ২২টি গণ-সংগঠনের এবং বন্দীমুক্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দু'টি কনভেনশনের প্রস্তাবেই মূল দাবি ছিল "সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই"। দু'টি কনভেনশনেই প্রায় সমস্ত বক্তা এই দাবিকে সামনে রেখে সরকারের কাছে বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির নীতি ঘোষণার, অবমাননাকর শর্তগুলি বাদ দেবার এবং দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানিয়েছেন। আমরা এই ঐক্যবদ্ধ প্রবণতাকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশিষ্ট

কী বলছেন 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি'-র বন্ধুরা?

প্রাক-নির্বাচন পর্বে প্রত্যক্ষভাবে সিপিআই(এম)-এর প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে সংগঠিত 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি' কর্তৃক বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রকাশিত পুস্তিকাটির শিরোনাম : 'মানবাধিকারের রাজনীতি, না মানবাধিকার নিয়ে রাজনীতি?'

ওপরের শিরোনামটি বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিতর্কে প্রাক-নির্বাচন পর্বে প্রত্যক্ষভাবে সিপিআই(এম)-এর প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে সংগঠিত 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি' কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকার। যদিও তাঁরা পুস্তিকার শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ-সম্পর্কে মানবাধিকার আন্দোলনের মধ্যে 'কোনো মতবিরোধ নেই'। এই দাবিটি যে হাস্যকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের মূল প্রবন্ধের মধ্যেই মূল বিরোধের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১) পুস্তিকায় দাবি করা হয়েছে: ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকারও 'বন্দীমুক্তির জন্য' একটি কমিটি তৈরি করেছিল। ঠিকই বলেছেন তাঁরা— 'কমিটি'টি (তবে আমাদের ধারণা ছিল, এবং তার অন্যতম সদস্য দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানালেন, মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেটের চার সদস্যকে নিয়ে যা তৈরি হয়েছিল, সেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি ক্যাবিনেট সাব-কমিটি) 'বন্দীমুক্তির জন্য'ই তৈরি একটি পুরোপুরি সরকারি কমিটি। সেই সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর সেই সাব-কমিটির উপর দায়িত্ব ছিল তা কার্যকর করার। কিন্তু এবার আধা-সরকারি রিভিউ কমিটিটি তৈরি হয়েছে কোনো বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য, এবং সেটাও সদস্যদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে নয়, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া টার্মস অফ রেফারেন্সের

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ভিত্তিতে। আর নকশালপন্থীদের ক্ষেত্রে মূলত পুরোপুরি বেসরকারি-ভাবে, বন্দীমুক্তি ও গণদাবি (প্রস্তুতি) কমিটির দেওয়া তালিকার ভিত্তিতে। সে তালিকা যাতে সুষ্ঠভাবে তৈরি হয়, সেজন্য সেই কমিটির প্রতিনিধিদের জেলে জেলে ঘুরে বন্দীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। দুটো কি এক হলো?

২) পুস্তিকায় সঠিকভাবেই দাবি করা হয়েছে: ১৯৭৭-এ সবার মুক্তির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও মুক্তির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় নি। ঠিকই, সবার মুক্তি পেতে পেতে প্রায় দেড় বছর সময় লেগে গিয়েছিল। অনেক তথ্যও তাঁরা এ সম্পর্কে দিয়েছেন। ঢালাও মুক্তির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, এবং এমনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সমস্ত আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাকে 'খামোকা টালবাহানার কৌশল' বলে নাকচ করে দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তির উপর গুরুত্ব দিতে নির্দেশ সত্ত্বেও, প্রধানত আমলাদের বাধা এবং অন্যান্য টালবাহানার কারণে প্রচণ্ড বিলম্বিত হয়েছিল সবার মুক্তি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সবারই মুক্তি কিন্তু মিলেছিল। কিন্তু এবার মুক্তির কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না থাকার ফলে, আমাদের ধারণামতো, প্রথমত, সবার মুক্তি পাবার কোনো গ্যারান্টিই মিলছে না; এবং দ্বিতীয়ত, সেই প্রক্রিয়া আরো অনেক বেশি বিলম্বিত হবার বাস্তব আশংকা থেকেই যাচ্ছে। তবে 'ফ্রেন্ডস'-এর সোৎসাহ সমর্থনের উপর নির্ভর ক'রে মমতার সরকার দেশে দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিগত সাড়ে চারশো বছরের অভিজ্ঞতাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে যদি সংসদীয় ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত আমলাতান্ত্রিকতাকে পুরোপুরি অতিক্রম করে ফেলতে পারে, তবে সেটা তো সত্যিই অভিনন্দন জানাবার মতো অভূতপূর্ব একটি ঘটনা হবে!

৩) অনেক রাজনৈতিক কর্মী জেলে থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে পূর্ববর্তী সরকার অবশ্যই অন্যায়ভাবে তাঁদের 'রাজনৈতিক' স্বীকৃতি দেয় নি, ফলে মুক্তির প্রশ্নে জটিলতা থেকে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেয় নি ঠিকই, তবে একেবারে না দিয়ে থাকলে সদ্যগঠিত রিভিউ কমিটি যে সর্বমোট একশোর কাছাকাছি 'রাজনৈতিক' স্বীকৃতি-যুক্ত বন্দীদের মুক্তির সুপারিশ ইতিমধ্যেই করেছেন, তাঁরা কোথা থেকে এলেন, কে তাঁদের স্বীকৃতি দিলো— এ সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিলছে না!

৪) তাছাড়া মুক্তির প্রশ্নে আরও যে সব আইনি জটিলতা ও সমস্যা আছে, পুস্তিকাতে সে সব কথাও বলা হয়েছে। আমরাও তো সে দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে-ই ক্ষমতায় আসুক, তাঁর যতোই শুভেচ্ছা থাক, তাঁকে আমলাতন্ত্রের নাগপাশে মূলত আবদ্ধ হতেই হবে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। তবে আসল কথা, কাজটা করার ইচ্ছে আছে কিনা, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে কাজে নামা হয়েছে কিনা। সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি ফেরত দেবার সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। পরবর্তীকালে অধঃপতিত হলেও, অন্তত বন্দীমুক্তির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা ছিল, এবং মোটামুটি আঁটঘাট বেঁধেই তারা কাজে নেমেছিল বলে, বিলম্বিত হলেও সমস্ত বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। আর বর্তমান সরকার তো সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্তই নেয় নি। তাই 'গণতন্ত্রের বন্ধুদের' আইনি প্রতিবন্ধকতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেবার অজুহাত তুলতে হচ্ছে। এ সব প্রতিবন্ধকতা ১৯৭৭-এ ছিল না? তবু তো বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনবোধে আদালত থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করার অনুকূলে সুপ্রিম কোর্টের ১৯৮০ সালের সুস্পষ্ট রায় এবং ১৯৯২-এ এই রাজ্যে জেল কোড বাতিল করে কার্যকর নতুন আইনে 'হিংসা-অহিংসা'-র প্রশ্নটিকে বন্দীদের 'রাজনৈতিক' স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে বিবেচনায় না আনার বিধি ১৯৭৭-এ ছিল না। আজ সেই অতিরিক্ত অনুকূল অবস্থাটি রয়েছে। এই নতুন আইনে আর একমাত্র আদালত বা সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে আইজি (প্রিজন্স)-কে এই স্বীকৃতি দেবার বিধি কিছু নতুন জটিলতাও সৃষ্টি করছে।

৫) পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে : ১৯৭৭ আর ২০১১-র পরিস্থিতি কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। তাই কি? কোনো পরিস্থিতিরই কখনও একই চরিত্র ও একই মাত্রা-সহ পুনরাবৃত্তি ঘটে না। তাই একমাত্র ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞরাই সেরকমটা দাবি করে থাকে। বন্দীমুক্তির প্রশ্নে বর্তমান সরকারের অবস্থান সম্পর্কে কোনো সমালোচকই ইতিহাস সম্পর্কে অত অজ্ঞ ধরে নেওয়াটা ঠিক নয়। তাই বলে মৌলিক প্রশ্নে দুই সময়কালের মধ্যে সাদৃশ্য কি সত্যিই নেই? সত্তরের দশক, বিশেষত জরুরি অবস্থার সময়কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্র, মানুষ তার বিরুদ্ধে ভোটকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সেই জমানার অবসান সূচিত করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের বিশেষত শেষ পঁচিশ বছরে কায়েম হয়েছিল সিপিআই(এম)-এর পার্টিগত স্বৈরতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজের প্রধান অংশেরই উপলব্ধি এটা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য বক্তৃতায়, এমনকি 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি'-র প্রাক্-নির্বাচনী প্রচারে বার বার এই একই উপলব্ধির কথা ("বিসর্জন দিতে হবে স্বৈরাচারী, গণহত্যাকারী, মানবতা-বিবর্জিত আমলাতান্ত্রিক বাম শাসনকে" : 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি'-র *দাবিপত্র*) প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত এই উপলব্ধিই ছিল বাম শাসনের বিরুদ্ধে এবারকার বিপুল জনাদেশের মূল উৎস। হঠাৎ আজ কেন বদলে গেল তাঁদের এই উপলব্ধি! সেই মূল ও সঠিক উপলব্ধির প্রেক্ষিতে যুক্তিযুক্তভাবেই দাবি তুলতে হবে : ১৯৭৭-এ কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্রের অবসানে যেমন 'জেনারেল অ্যামনেস্টি'-র ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি উত্থাপিত ও কার্যকর হয়েছিল, আজও তেমনি সিপিআই(এম)-স্বৈরতন্ত্রের অবসানে একই ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি কার্যকর করা হোক? তবে 'ফ্রেন্ডস' ভোটের আগে নিঃশর্ত মুক্তির দাবির শরিক হলেও, শাসক দলের বিরুদ্ধে গিয়ে আজ তা নিয়ে বিশেষ সোচ্চার হওয়াটা যে কোনো কারণেই হোক, সম্ভাবত সমীচীন মনে করছেন না।

৬) তাছাড়া নিঃশর্ত মুক্তি ও 'বিবেকের বন্দী' হিসেবে মুক্তি নিয়ে বিতর্কটিকেও অনর্থক টেনে আনা হয়েছে। পুস্তিকাটিতেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ২০০৯-এ কলকাতায় সিডিআরও-র সভায় প্রয়াত তাত্ত্বিক বালাগোপালের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে এপিডিআর-এর প্রতিনিধিরা 'তীক্ষ্ণভাবে খণ্ডন করেছিলেন'। এপিডিআর তো সেই অবস্থান থেকে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

সরে আসে নি! অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তা নতুন করে উত্থাপনের তাৎপর্য কী? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, গত ৭ জুন 'একদিন' পত্রিকায় বালাগোপালের এই সম্পর্কিত বক্তব্য বলে যে লেখাটি বেরিয়েছে, সেটি মূল লেখার সংক্ষিপ্তায়ন (যদিও তা স্বীকার করা হয় নি), এমনকি বক্তব্যেরও কিছুটা বিকৃতায়নও।

৭) তবুও, বর্তমান সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি মেনে না নিয়ে, উপরন্তু অপমানজনক শর্তে মুক্তির কথা বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিলেও, তার মধ্যেও 'ফ্রেন্ডস্' খুঁজে পেয়েছেন এক 'আশার আলো', 'রূপোলি রেখা'। আমাদের হয়তো দুর্ভাগ্য বা দৃষ্টিশক্তির অভাব যে, আমরাই সেটা দেখতে পাচ্ছি না! তাঁদের বক্তব্য, সবার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মেনে না নিলেও অন্তত ইস্যুটির স্বীকৃতি মিলেছে, 'যোগ্যতম' ব্যক্তিদের নিয়ে রিভিউ কমিটি তৈরি হয়েছে— এটুকু অগ্রগতিকে আমাদের অস্বীকার করা উচিত হবে না। 'ফ্রেন্ডস্'-কে নিয়ে মুস্কিল দাঁড়িয়েছে এটাই যে, তাঁরা বিষয়টিকে মজুরি নিয়ে দর-কষাকষির প্রক্রিয়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। প্রশ্নটি গুণগত— পরিমাণগত নয়, প্রশ্নটি নীতির— দর-কষাকষির নয়। 'নিঃশর্ত' মুক্তির দাবির বদলে প্রাথমিকভাবে 'শর্তাধীন' মুক্তিকে মেনে নেবার তাই প্রশ্ন উঠতে পারে না। অন্তত কোনো নীতিনিষ্ঠ মানুষ সেটা মেনে নিতে পারে না। এরকম অবস্থায় পড়লে তাঁরা কী করতেন জানি না, তবে বর্তমান নিবন্ধকারকে যখন ১৯৭৫-৭৭-এ জরুরি অবস্থার প্রায় পুরো সময়টাই (২১ মাস) জেলে কাটাতে হয়েছিল, তখন তাকেও এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। মাস তিনেকের মাথায় তাঁকে শর্তাধীন মুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল— '*শুধুমাত্র*' তার সম্পাদিত পত্রিকাটি ('*অনীক*') বন্ধ করে দেবার শর্তে। সেই প্রস্তাব স্বভাবতই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আজকেও আদর্শবান কোনো বন্দী রাজনৈতিক কর্মী মুক্তি পেলে জেলের বাইরে গিয়ে 'অশান্তি' না করার বা 'গন্ডগোল না পাকাবার' 'নিশ্চিতি' দিয়ে তার বিনিময়ে মুক্তি পেতে রাজী থাকবেন— এমন কথা ভাবাটাই আসলে তাঁদের প্রতি জঘন্য অপমান। তাই, দুঃখিত, 'আপাতত' সেটাকে প্রাথমিকভাবে 'আশার আলো' বা 'রূপোলি রেখা' হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা পারছি না।

আর সে কারণেই রিভিউ কমিটি কত 'যোগ্যতম' ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হয়েছে, সেটা আদৌ বিচার্য বিষয় হতে পারে না। তবে কোনো সরকারি কমিটিতে যাওয়া উচিত কিনা, এ নিয়ে কেউ বিতর্ক তুলেছেন বলে জানি না, তাই সে ব্যাপারে পুস্তিকাটিতে অযথা বাক্য ব্যয় করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য একটাই : কমিটির টার্মস্ অফ রেফারেন্স আপত্তিকর না হলে স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে যাওয়া যেতেই পারে, তবে তা আপত্তিকর বা অপমানজনক হলে যাওয়ার যুক্তি নেই; কিংবা গেলেও প্রথমেই সেই শর্ত বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি তোলা উচিত, রাজি না হলে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসা উচিত। আর কমিটি যদি তবুও সবার নিঃশর্ত মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে, তবে বিনা দ্বিধায় তাকে অভিনন্দন জানাবো— কিন্তু সব সময় নীতিগতভাবে ও বাস্তবত মূল আস্থাটা রাখবো গণআন্দোলনের উপর, আন্দোলনকেই মূল ও নির্ধারক বিষয় হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবো।

৮) পুস্তিকাটিতে কিন্তু এই রিভিউ কমিটির শেষ তিনটি শর্ত নিয়ে যে প্রশ্ন আছে, তা স্বীকার করে নিয়ে প্রথম দুটি সম্পর্কে বলা হয়েছে : সেগুলির 'কার্যকারিতা প্রায় নেই বললেই চলে'। কে সেটা ঠিক করলো? কমিটির অধিকারই নেই সেগুলি পাল্টে দেবার বা অকার্যকর করার। একমাত্র কমিটির স্রষ্টা, অর্থাৎ সরকারই পারে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেটা পাল্টাতে।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, অন্তত তৃতীয় আপত্তিকর শর্তটিকে (অন্যদেরকে মুক্তির পর অপরাধ করতে উস্কানি দেবার সম্ভাবনা) তাঁরাও আপত্তিকর বলে স্বীকার করেছেন, বলেছেন : ''আপত্তি অবশ্যই জানাতে পারি। কমিটিতে আমাদের পরিচিত সদস্যদের কাছেও আপত্তির কারণ জানিয়ে কমিটিতে আপত্তি জানানোর অনুরোধ করতেই পারি।'' বন্ধুদের অবশ্য ধন্যবাদ জানাই এ জন্য যে, তাঁদের প্রায় ২৫০০ শব্দের ওই পুস্তিকাটিতে অন্তত আড়াইটি লাইন (অর্থাৎ ০.০০১ শতাংশ) তাঁরা সরকারি শর্ত সম্পর্কে আপত্তি জানাবার জন্য ব্যবহার করেছেন! কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি (আবার অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত হবার সম্ভাবনা) তাঁদের কাছে আপত্তিকর কিনা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল না। এবং সেটাই হচ্ছে সমস্যা। গুণগত তথা নীতিগত বিচারে চরম অপমানকর বিষয় সম্পর্কে হয় তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করছেন, কিংবা আপত্তি করার শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

এর পরেও কিন্তু আমরা আশা করবো, সবাই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন, এবং আমরা সবাই মিলে অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধ ও সরকার-নিরপেক্ষ বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরতে পারবো।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই

❏

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করো

❏

কালা আইন ইউএপিএ-র প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ করো

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

আলোচনা

সম্মানের সঙ্গে উন্নয়ন

অধ্যাপক অমিত ভাদুড়ি-র লেখা "আত্মমর্যাদার সাথে উন্নয়ন" বইটি নিয়ে কলকাতায় দুদফা আলোচনা হয়। তত্ত্বচর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কর্মীদের আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের পর দ্বিতীয় দফা আলোচনার শেষে উন্নয়নের বিকল্প ধারণা নিয়ে একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এই খসড়াটিকে একটি রূপায়ণযোগ্য রাজনৈতিক পরিকল্পনায় রূপান্তরিক করার লক্ষ্যে, আলোচনার জন্য প্রকাশ করা হলো।

যে মানুষ খেটে খান তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কী চান, তবে তিনি দুটি কথা নিশ্চয়ই বলবেন।

চাই জীবিকা নির্বাহের সুনিশ্চিত উপায়।

চাই এক গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেখানে যে কোনও ব্যাপারে কী করণীয় তা নিজে বাছা যাবে, অপরের হুকুম মাফিক চলতে হবে না।

এই দুটি চাহিদা নিশ্চিত হয়েছে জানলে আসবে পর্যাপ্ত ভাত কাপড়, মাথার ওপরে ছাদ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, সংস্কৃতির কথা। ব্রিটিশরা চলে গিয়েছে ৬৫ বছর, খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে কোনও নিশ্চিন্তিই নেই। শুধু কি খেটে খাওয়া মানুষ? খুব একটা অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি নেই এমন বিভিন্ন পেশার লোকজন, ছোট শিল্প, ব্যবসার উদ্যোগী মালিকরাও স্বস্তিতে নেই। আর দেশ কীভাবে চলবে তা নিয়ে তো তাঁদের কোনও নির্দিষ্ট সুপারিশের দাম নেই।

দিল্লিতে সরকারি দুর্নীতি ও কুকীর্তির দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস টানা ভার। দেশ চালাচ্ছে দেশিবিদেশি কর্পোরেট কর্তারা, ঘনিষ্ঠ তাদের সম্পর্ক গ্রামের কায়েমি স্বার্থের রক্ষকদের সঙ্গে। কর্পোরেট, গ্রামীণ কায়েমি স্বার্থ, বিদেশি টাকা নিয়ন্ত্রণ করছে সংসদের প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দলকে। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে নদী, জল-জঙ্গল-জমি-খনিজ সম্পদ। মাটির তলার খনিজ সম্পদ থাকলেই কর্পোরেটদের স্বার্থে সরকার সেখানকার অধিবাসীদের বিতাড়ন করছে। অনেক ক্ষেত্রেই এঁরা আদিবাসী মূলবাসী জনজাতির মানুষ। যে জোটই সরকার বানাক, জিতছে কর্পোরেট ও তাদের মিত্র কোনও শক্তি।

আজ দেশের শাসকরা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বেড়েছে বলে আহ্লাদে আটখানা। অথচ দারিদ্রের বৃদ্ধি ঠেকানোর কোনও কার্যকর পরিকল্পনাই দেখা যাচ্ছে না। সংসদের সব রাজনৈতিক দলই নয়া উদারনীতির অনুগত ভৃত্য। দেশের সমস্যার তারা একটাই সমাধান বোঝে। কর্পোরেটদের বিনিয়োগ। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার খাতিরে পণ্যের দাম কমাতে হয়, এটা কর্পোরেটরা করে শ্রমের খরচ কমিয়ে, যাকে ঢাক পিটিয়ে বলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। তাই কর্পোরেট বিনিয়োগের লক্ষ্য শ্রমিকসংখ্যা কমানো, এই বিনিয়োগ ন্যূনতম শ্রমিক নিয়ে কাজ চালাতে চায়, ফলে তা কর্মসংস্থানহীন।

তাহলে শ্রমজীবী মানুষের কী লাভ অমন বিনিয়োগে? এই রাজনৈতিক মহল তথা বর্তমান রাষ্ট্র এবং কেন্দ্র, রাজ্যের সরকারিগুলির আশ্বাস- কর্পোরেটদের মুনাফা আর তার থেকে রাষ্ট্রকে দেওয়া কর থেকে উপকার চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে নিচের তলার মানুষের ঘরে। নিচের তলার মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য দেখেছেন কিছুই প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় না। ওই সামান্য উপকারও আমলা-পুলিশ-পার্টি চক্রের সর্বদা মেলে রাখা হাতে আটকে যায়। সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয়, স্কুল হয় না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলে না, না থাকে ওষুধ, না ডাক্তার। কর্পোরেটদের বিদ্যুৎ চাই, বিশাল বাঁধ গ্রামের পর গ্রাম ডুবিয়ে দেয়, সেচের সুযোগ পায় কেবল গ্রামের বদবাবুচক্র। আর নানা রোজগার, আবাসন, বেকারভাতা যোজনার যেটুকু আসে মানুষের হাতে তা তাঁদের হক্কের পয়সা হিসাবে আসে না, আসে রাজনৈতিক দলের বোড়ে-ঘোড়া-লেঠেল হওয়ার পুরস্কার অথবা ভোটের জন্য খয়রাতি।

পশ্চিমবাংলায় ২০০৫-০৬ সালে সারা বছর বেকার ছিলেন সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ মানুষ। ওই সালে আরও প্রায় আঠারো লক্ষ মানুষ কোনও না কোনও সময় বেকার ছিলেন। ২০১০ সালে পনেরো থেকে ঊনষাট বছর বয়সের মানুষের সংখ্যা ফি বছর বাড়ছিল তেরো লক্ষ করে।

এই অবস্থায় আশু লক্ষ্য— কর্মসংস্থান ও জীবিকার নিশ্চিতি। সকলের হাতে কাজ চাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান। কোন্ পথে? টাটা সিঙ্গুরে দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সাতশো কর্মী নিয়োগ করতে চেয়েছিল, সহায়ক কারখানাগুলিতে নিয়োগ হতো আরও চার হাজারের মতো কর্মী। এ ধরনের বিনিয়োগের পেছনে ছুটে লাভ কী? কর্পোরেটরা বছরে কটা কারখানা বানালে বছরে তেরো লক্ষ মানুষের হাতে কাজ দেওয়া যাবে? এত লোকের জন্য কর্মসংস্থান করতে পারে কৃষি আর ছোট শিল্প, বিশেষত কৃষিপণ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গ্রামীণ শিল্প।

পশ্চিমবাংলা কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতায় অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

এখানে বর্গা নথিকরণ ও কিছু খাস জমি বিলি হয়েছে। কিন্তু বীজ, সার, ওষুধ, মিনিকিট, সেচের জল, সুলভ ঋণ মারফত সরকারি বিনিয়োগ শুরু হয়ে আবার শীঘ্র তা বন্ধ হয়েছে। পুরোপুরি ভূমিসংস্কারও হয়নি আর সরকারি বিনিয়োগ ও সমবায়ের মাধ্যমে দুর্বলতর কৃষকদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা হয়নি। বর্গাদার ও ক্ষুদ্র কৃষক কৃষিকাজের খরচ মেটাতে না পেরে বাধ্য হয় ধনী কৃষককে জমি বা তার স্বত্ব বেচে দিতে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ফলে ধনী কৃষকরা জমির উপর কব্জা কায়েম করে এবং জমির পরিমাণ খুব বেশি না হলেও পরিকাঠামো ও ঋণের উপর নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রভুত্ব করছে। সরকারি সেচের অভাবে পাম্পসেটের মালিকরা এক একজন জলপ্রভু হয়ে উঠেছে। সরকারের সাহায্যে কর্পোরেটরা কৃষিজমির উপর থাবা বসাচ্ছে।

তারপর এনআরইজি কর্মসংস্থান প্রকল্প এল। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষির আয় সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য এই সুযোগ একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে, তা না হলেও অনেক রাজ্যের চেয়ে কম উৎসাহ দেখা গিয়েছে এবং দুর্নীতি দমন করে ঠিক ঠিক হাতে কাজ ও মজুরি পৌঁছনোর ব্যাপারে নজরদারির প্রমাণ নেই।

উৎপাদনশীলতা কম মানে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জায়গা আছে। হিসাবে করা হয়েছে ভূপৃষ্ঠের জলসেচ সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার, মানে পুকুর কাটা, খাল কাটানোর মতো সাবেকি কাজ নিয়মিত করলে কৃষির উৎপাদন বাড়বে শতকরা বিশ ভাগ। আরও শতকরা বিশ ভাগ বাড়বে শিক্ষার প্রসার ঘটলে। চাষি ও গ্রামীণ মজুরের আয় বাড়লে তারা নানান জিনিস কিনবে। মংলা হাটের মোটা জামা-কাপড় কিনবে, লণ্ঠন কিনবে, হিরো হোন্ডা বাইক না কিনলেও একটা সস্তা সাইকেল কিনবে, এলইডি পর্দা না থাকলেও তার নতুন টিভিতে বাংলা ছায়াছবি ভালোই আসবে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মালের একটা বাজার হবে, ক্রমে এই মাল তৈরির কারখানা হবে। একটা বাজার গড়ে উঠবে। গ্রামের বাজারের জন্য মালের চাহিদা বাড়লে (এবং নাগরিক কর্ম-সংস্থানের ইজি প্রকল্প চালু করে) শহরের শ্রমিকদের আয় বাড়লে আর ছোট ব্যবসায়ীদের হাতে দুটো পয়সা এলে এই রাজ্যের বাজার প্রসারিত হবে। এই প্রসঙ্গে ভেনেজুয়েলার 'মারকাল' ও 'পিডিভ্যাল' ব্যবস্থার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবস্থায় সরকার স্থানীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে খাদ্য ও অন্য পণ্য কিনে তা নিয়ে গুদামে সংরক্ষিত রেখে ভর্তুকি দিয়ে বিক্রি করে।

সব মিলিয়ে অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে এক অভ্যন্তরীণ বাজার। এই বাজারে চাহিদার ভিত্তি শ্রমজীবী ও পেশাজীবী মানুষ ও ছোট উদ্যোগপতিদের আয় কর্পোরেট মুনাফা ও উচ্চবিত্তের উচ্চবেতন নয়।

এ পর্যন্ত ভাবা হলো ভোগ্যপণ্যের বাজার নিয়ে। মূলধনী দ্রব্য তৈরির জন্য চাই রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের বড় উদ্যোগ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বদনাম কিনেছে উদ্যোগ, কর্মসংস্কৃতি ও লাভ হাসিল করার কর্মসূচির অভাবের জন্য। ওইসিডি ভুক্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে বেসরকারি মালিকানায় বেচে দেওয়ার দরকার পড়ে না। যদি বেসরকারি উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে দেওয়া হয় তাহলেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অনেক উন্নতি দেখা যায়। এই কলকাতাতেই প্রতিযোগী বেষ্টিত সরকারি টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের একচেটিয়া বেসরকারি কোম্পানির পরিষেবার তফাত লক্ষণীয়। অবশ্য বেসরকারি বড় উদ্যোগকে ছোট উদ্যোগের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

কৃষিকে ও সরকারি উদ্যোগকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে ছোট ছোট গ্রামীণ উদ্যোগের এক জাল গড়ে তুলতে পারলে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ ঘটতে থাকবে। নানা লাইনের কাজের উৎপত্তি হবে, দূর হবে শহরের যুবশক্তির বেকারত্ব।

সমাধান কী ভাবে?

কেন্দ্র, রাজ্য, দুই প্রশাসনই কর্পোরেটদের আজ্ঞাধীন। গ্রামে যা টাকা আসে দিল্লি থেকে, বা রাজ্যের কৃষি, সেচ, পঞ্চায়েত ও আরও নানান খাতে, তা পৌঁছতে পারে না গরিবদের হাতে বা তাদের ইঙ্গিত কাজে, কারণ মাঝখানে বসে আছে পার্টি-আমলা-বদবাবুদের চক্র। জমি, জল, ঋণ, সব সম্পদ কুক্ষিগত করে এরা পঞ্চায়েতগুলোকেও নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করে। তাই জঙ্গলমহলে সাঁওতাল মাহাতোর হাতে কাজ নেই, আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যু, কিন্তু স্থানীয় পার্টি ও হার্মাদ নেতা অনুজ পাণ্ডের অট্টালিকার দাম ৩৬ লক্ষ।

সুতরাং এসমস্ত কাজ রাষ্ট্রের চিরাচরিত কর্মপ্রক্রিয়ার হাতে ছেড়ে রাখলে চলবে না। বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও আধিকারিক বা পঞ্চায়েতের হাতে তো নয়ই। আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সব সময়েই অনুপস্থিত থাকে। যা থাকে তা হলো কর্পোরেটদের এবং প্রভাবশালী স্বার্থের চাপ। ফলে এই জাতীয় সব প্রকল্প ব্যর্থ হয়েই থাকে। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হলো গ্রামাঞ্চলে পরিকল্পনা, তার বাস্তবায়ন ও বরাদ্দ অর্থের ব্যয় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নিয়ন্ত্রণ। সমস্ত প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হতে হবে স্থানীয় মানুষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

কাজেই নিজেদের স্বার্থে উৎপাদন ও গ্রামীণ বিকাশের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হলে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দখল করতে হলে গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের দুটি বিধিবদ্ধ সংগঠনকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। এই দুটি হলো গ্রামসংসদ ও গ্রামসভা। প্রথমটি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনের সম্পূর্ণ নির্বাচকমণ্ডলী। দ্বিতীয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পূর্ণ নির্বাচকমণ্ডলী। এখানে তাহলে চিন্তা সরাসরি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের নয়। এই সভাগুলিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের হাতিয়ার হিসাবে দেখতে হবে। গরিব মানুষকে এগিয়ে এসে গ্রামসভা ও গ্রামসংসদের পরিচালনা ও জল, জঙ্গল, জমি, খনিজ সম্পদ রক্ষা ও ব্যবহার নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। সম্পদ লুঠ বন্ধ হয়ে যাবে ও নিজেদের আধিপত্য বিনষ্ট হবে এই ভয়ে কায়েমি স্বার্থ এই প্রচেষ্টাকে বেহাল করার চেষ্টা করবে এবং শেষাবধি সরাসরি আক্রমণ করবে। তখনই শুরু হবে জনগণের অধিনায়কত্ব (পিপলস প্রোটাগনিজম) প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম। গ্রামাঞ্চলে এই সংগ্রাম

এর পর ২৮ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের আগামী পাঁচ বছর ও ভারতে বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ

সুমন্ত ব্যানার্জী

পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের পরাজয়ের পর মানুষ এখন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার সম্পর্কে আশা ও আশঙ্কার দোলায় দুলছে। পরিবর্তনের এই আকাঙ্ক্ষাকে নতুন সরকার পূরণ করতে পারবে না, কারণ এই সরকার নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আর সিপিআই(এম)-এর ক্ষেত্রে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম ছিল কফিনের সেই শেষ পেরেক, যা বছরের পর বছর ধরে জমা হতো থাকা ক্রোধ ও হতাশার অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। সিপিআই(এম) দল ও ভারতের বামপন্থীদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য কী?

পুরোপুরি বদনাম কুড়ানো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বদলে অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্রের তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমন্ডলী পুরোনো এই প্রবাদটিকে উল্টে দিলেন: পুরোপুরি জানা শয়তানের চেয়ে অর্ধপরিচিত শয়তান ভালো।

একদিকে সিপিআই(এম) তিন দশক ধরে এই রাজ্যে বামপন্থী জোট সরকার চালানোর সময়কালের ক্ষমার অযোগ্য সব অপরাধ ও অন্যায় কার্যকলাপের দাম দিল। অন্যদিকে আবার একই রকমের বা হয়ত আরও বেশি নীতিবর্জিত একটি দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য আগামী পাঁচ বছর ধরে নির্বাচকমণ্ডলী নিজেদেরই শাপশাপান্ত করবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে বিজয়ী দল ও তার সমর্থকেরা আনন্দে ভাসছেন। মমতা ব্যানার্জীর বিজয়কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার ফল হিসাবে দেখা যেতে পারে: (১) সিপিআই(এম)-এর দুর্বিনীত নেতা, কর্মী ও পঞ্চায়েত প্রধানদের কৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্রোধ; (২) সিভিল সোসাইটি যা শহরের মধ্যবিত্তদের পেশাগত জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত— বাড়ি কেনা থেকে বিক্রি করা পর্যন্ত সবকিছু নির্ধারণ করে দেয়— তার উপর সিপিআই(এম)-এর দখলদারি থেকে বেরোনোর জন্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকুতি; এবং (৩) এর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্পের অভাবে সমাজের এই দুই অসুখী অংশ একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেয়।

কিন্তু এ বিজয় অর্জনের জন্য অনেক দাম দিতে হয়েছে পার্টিটিকে— সে কথায় পরে আসছি।

ভোটারদের মধ্যেকার দুটি প্রবণতা— একদিকে মূলগতভাবে সিপিআই(এম) বিরোধী চিন্তা এবং অন্যদিকে পরিবর্তনের জন্য, এর চেয়ে ভালো প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চাকরির জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা— এই দুইয়ের মিলনের একটা প্ল্যাটফর্ম দিলেন মমতা ব্যানার্জী। এই বেছে নেওয়াটা রাজনৈতিকভাবে বেছে নেওয়া নয়, বর্তমানে টিকে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক একটি কাজ। ১৯৭৭ সালের সরকার বিরোধী ভোটের সঙ্গে ২০১১ সালের সরকার বিরোধী ভোটের তফাত এইখানেই।

মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকদের সামনে একটি রাজনৈতিক বিকল্প ছিল, জরুরি অবস্থার কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট হাজির করেছিল সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কার ও গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সেই সময়কার বামপন্থী (পূর্ণাঙ্গ না হলেও) কর্মসূচির রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কোনো মতাদর্শগত দিশা নেই আজকের তৃণমূল নেতৃত্বের। ১৯৭৭ সালের মতাদর্শের দিক দিয়ে একধর্মী বহুদলীয় বামফ্রন্টের বিপরীতে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি সম্পূর্ণভাবে এমন এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ক্যারিশমা নির্ভর একটি দল, যিনি বামদের কাছ থেকে কিছু রাজনৈতিক শ্লোগান কেড়ে নিয়েছেন, পুরনো কংগ্রেসী, বিক্ষুব্ধ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সুবিধাবাদী মাওবাদী কর্মী থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ অফিসার ও বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীর দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধিদের একটি দলকে তাঁর চার পাশে জড়ো করেছেন।

তাঁর নির্বাচনী প্রচারেও তাঁর যে ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছিল তাতে জনপ্রিয় গরিব-বন্ধু ভাবমূর্তির (দলাপাকানো শাড়ি পরা, ঘিঞ্জি মধ্যবিত্ত এলাকায় অতিসাধারণ বাড়িতে বসবাস) পাশাপাশি ছিল চটজলদি সমাধানের প্রযুক্তিগত চমক সৃষ্টি করতে দক্ষ মিডিয়া-মিত্র এক রাজনীতিবিদের ছবি। যেমন দশ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দান (দক্ষতাসম্পন্ন বেকারদের জন্য), কলকাতাকে লন্ডন বানানোর প্রতিশ্রুতি দান (উচ্চাকাঙ্ক্ষী উচ্চমধ্যবিত্ত যুবাদের জন্য)। মা-মাটি-মানুষের প্রতি তাঁর উচ্চকিত আনুগত্যের দাবি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তায় প্রাধান্য পায় ঔপনিবেশিক লন্ডন।

এর থেকে তাঁর শাসনকালে রাজ্যের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ভোট, আর তৃণমূলের উন্নত-তর প্রশাসনের প্রতিশ্রুতির জন্য ইতিবাচক ভোট— এই দুটি নির্বাচনী প্রবণতা এমন এক জায়গায় অবস্থান করে যেখানে জনগণের মনোভাব সতত আশা ও আশঙ্কার দোলায় দোলে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যারা, সেই কর্পোরেট সেক্টরের চোখেও এই দ্বৈততা ধরা পড়েছে। মমতা ব্যানার্জীর বিজয় প্রত্যাশা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের তোলা সোর-গোলের মধ্যে, ভোটের ফল প্রকাশের ঠিক আগে সেই কর্পোরেট ক্ষেত্রের এক প্রতিনিধি সেই বিষয়টিই সরাসরি তুলে ধরেন:

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

খুব কম লোকই তাঁর পক্ষে ভোট দিয়েছে, সবাই ভোট দিয়েছে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে, এর অর্থ এই যে... বাংলা সিপিএম-কে ঘৃণা করে বেশি... এর অর্থ এই যে মমতার টিকে থাকতে হলে তা হবে তাঁর কাজের ভিত্তিতে... এর অর্থ এই যে পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার জন্য খোলাই থাকবে... (সুজিত এস ভাল্লা, চেয়ারম্যান, অক্সাস ইনভেস্টমেন্ট, *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ১৩ মে ২০১১)

বিধানসভায় তাঁর (মমতা ব্যানার্জীর) যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তাতে পরবর্তী পাঁচ বছরে টিকে থাকা নিশ্চিত। কিন্তু যারা তাঁকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছেন, এই সময়কালে তাঁর কাজকর্ম কীভাবে তাদের রোজকার জীবনে পরিবর্তন আনবে?

'পরিবর্তন' না প্রত্যাবর্তন?

নির্বাচনী প্রচারের সময় তৃণমূল ও সিপিআই(এম) সম্পর্কে দুটি কথা খুব চলছিল— তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি হলো গত তিন দশক ধরে ক্ষমতায় বামফ্রন্টের একচেটিয়া ক্ষমতার, ব্যর্থ জমানার 'পরিবর্তন', আর সিপিআই(এম) ভোটারদের বলছেন তাদের ক্ষমতায় 'ফেরাতে', যাতে করে তারা ১৯৭৭ সালের ভুলে যাওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ণ করতে পারেন। এখন পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতির ওপর দাঁড়িয়ে তৃণমূল যখন বিজয়লাভ করেছে, মমতা ব্যানার্জীর প্রতিশ্রুতিগুলি পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা জাগিয়েছে, নতুন সরকারকে সেগুলি পূর্ণ করতে হবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষাগুলি পরপর সাজালে এইরকম দাঁড়ায়:

(১) গত কয়েক বছর ধরে ক্ষমতাসীন স্থানীয় সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মীদের সহিংস ভীতি প্রদর্শনে জর্জরিত গ্রামাঞ্চলে দ্রুত শান্তি ফেরানো; (২) গণবণ্টন ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির মতো কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা প্রকল্পগুলিতে বিদ্যমান দুর্নীতির অবসান; এবং (৩) চাকরি সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিধান ও সুষ্ঠু প্রশাসনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও সমাজের পুনর্গঠন।

কিন্তু এই সব প্রত্যাশার মাঝে অনিশ্চয়তা ও ভীতির একটা পর্দা ঝুলছে। তৃণমূল কর্মীদের প্রতিশোধগ্রহণ— সম্প্রতিকালে সিপিআই(এম) কর্মী খুন ও কয়েকটি এলাকায় সিপিআই(এম) পার্টি অফিস ভাঙচুর করার মধ্যে যার প্রকাশ— শান্তির আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করছে। এ প্রবণতা আরও বাড়লে তা গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত হবে— এতদিন এরা শুধু সিপিআই(এম) হার্মাদদের কৃত মানবাধিকার ভঙ্গের বিরোধিতা করছিলেন, বামফ্রন্টকে পরাজিত করার জন্য এরা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিয়েছিলেন। এই ভয় আরও বাড়ে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের ১৮৪ জন বিধায়ক কারা সেটি খতিয়ে দেখি। এদের ৬৯ জনের বিরুদ্ধে বড় বড় অপরাধের অভিযোগ রয়েছে (তাদের নিজেদের বক্তব্য অনুসারেই, *অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রাটিক রিফর্মস অ্যান্ড নিউ ইলেকশনস ওয়াচ* তা নথিভুক্ত করেছে)। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ভারতের মূলধারার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চলেছে, যেখানে অপরাধী-প্রার্থীরাই নির্বাচকদের ভোট পেয়ে থাকেন। আর দুর্নীতির কথা উঠলে বলতে হয় যে এক বছর আগে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে এনেছেন তাঁরা ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছেন যে এঁরা সিপিআই(এম) প্রার্থীদের চেয়ে ভালো কিছু নন। সিপিআই(এম)-এর মতো একই রকম স্বজনপোষণ ও জনগণের টাকা নিজেদের পকেটে ঢোকানো। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল প্রার্থীরা জিতে আসার পর তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি কবীর সুমন নিজেই তাদের এই লুঠের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন, তিনি বলেন যে এরা সর্বভুক। এদের মুখে শুধু 'খাও, খাও'।

তবুও বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামের ভোটাররা তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দিলেন। এর থেকে মনে হয় যে তাঁরা অসহায় ও হতাশ। তাঁরা এই বাস্তবতাকে মেনে নিচ্ছেন যে অন্য সব দলের মতো তৃণমূলও দুর্নীতি বজায় রাখবে, কিন্তু তাঁদের আশা যে অন্তত শান্তি ফিরবে, অত্যাবশ্যক পরিষেবা পাওয়া যাবে।

মমতা ও কর্পোরেট স্বার্থ

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি দীর্ঘকালীন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার মতো বড়ো বিষয়ের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জী যেন এক অবোধ শিশু, তাঁর সামনে কী চ্যালেঞ্জ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তিনি। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে সেগুলির চেয়ে এগুলি অনেক কঠিন। রেলমন্ত্রী থাকাকালীনও তিনি গন্ডগোল পাকিয়েছেন— নতুন নতুন উচ্চগতিসম্পন্ন ট্রেন উদ্বোধন করেছেন, অথচ সেগুলির আর্থিক সম্ভবপরতা ও যাত্রীসুরক্ষার দিকে মন দেন নি, যার ফলে রেলের আয় কমেছে, দুর্ঘটনা বেড়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ বিচার করলে আমাদের চিন্তা হয়, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের 'দুরন্ত' (তাঁর একটি পছন্দের শব্দ, তাঁর দেওয়া নতুন ট্রেনের নাম— শব্দটির দুটো অর্থ— শক্তিশালী ও দুর্দমনীয়) প্রশাসনকে চালনা করবেন।

তাঁর বহুশ্রুত প্রতিশ্রুতির কয়েকটি দিয়ে শুরু করা যাক। কী করে তিনি সিঙ্গুরের ৪০০ একর জমি আসল মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন, যে জমির আইনি অধিকার এখনো টাটাদের ছোট গাড়ি প্রকল্পের হাতে? আর সরকার যদি সেই জমি বিরাট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে কৃষকদের হাতে ফিরিয়েও দেয়, তার আইনি প্রক্রিয়াতে অনেক সময় লেগে যাবে, আর কৃষকরা তো সেই জমিতে চাষ করতে পারবেন না, কারণ সেই কৃষি-জমিতে এখন কংক্রিটের রাস্তা বানানো হয়ে গেছে। সিঙ্গুরে তাঁর টাটা-বিরোধী আন্দোলনের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়ার কোনও কর্মসূচি কি মমতা ব্যানার্জীর আছে? হঠাৎ করে দশ লাখ চাকরি তিনি কোথা থেকে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

যোগাড় করবেন? বন্ধ ও লকআউট কারখানা-গুলির শ্রমিকদের চাকরি নেই, তারাও চাকরি ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায়। কোথায় তৈরি হবে নতুন কারখানাগুলি? শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রতিযোগিতায়, বড় শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে তিনি শীঘ্রই বড় শিল্পপতিদের দাবি মেনে নিতে শুরু করবেন।

ফিকি-র প্রধান কর্মকর্তা অমিত মিত্রকে তিনি যে তাঁর মন্ত্রীসভায় এনেছেন সেটা কাকতালীয় নয়। কিন্তু কীভাবে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রের জঞ্জাল পরিষ্কার করবেন? এ রাজ্যের ঋণের পরিমাণ প্রায় দু লক্ষ কোটি টাকা (বামফ্রন্ট সরকার এই ঋণ রেখে গেছে, এর প্রায় সবটাই ব্যয় হয়েছে কলকাতায় মহাকরণ ও জেলা সদর দপ্তরগুলির অলস কর্মীদের, স্কুলকলেজে পড়াতে না-আসা শিক্ষকদের ও হাসপাতালগুলিতে অকর্মণ্য ডাক্তারদের বেতনে ভরতুকি দিতে)।

বন্ধুতাপূর্ণ কেন্দ্র ভালো একটি অর্থনৈতিক প্যাকেজ দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেই অর্থ তো আবার সেই দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকর্মণ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর তৃণমূল জমানার নতুন রাজনীতিবিদ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের পুষতেই খরচ হয়ে যাবে— পঞ্চায়েতে এই দলের কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

জনগণকে দেওয়া পরিবর্তনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে নির্বাচন-পরবর্তী প্রত্যাবর্তনের আরামে ফিরে যেতে, বা ক্ষমতা জাহির করার, পুলিশ দিয়ে প্রতিবাদ দমনের পুরনো অভ্যাসে ফিরতে, আগেকার অ-সম ও নিপীড়নকারী ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে নতুন শাসক দলের শুধু এক ধাপ পেছোতে হবে। বিশ্বায়নের নয়া-উদারনৈতিক জমানায়, যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক বিকাশের চিহ্ন বলে ধরা হয়, তাকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মতো সামাজিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, সেখানে এটি একধরনের মঞ্জুরি পেয়ে যায়। মমতা ব্যানার্জীর সরকার যেহেতু নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাই এইসব সামাজিক দাবিগুলি পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এই সরকারকে উল্টোদিকে হাঁটতে হবে। হাঁটতে হবে তাদের পূর্বসূরী বামফ্রন্টের পথেই। বামফ্রন্টের চলার পথটি তাই সংক্ষেপে ফিরে দেখা দরকার। গত তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বকারী দল হিসাবে এবং বর্তমানে লোকসভা ও জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে— সংসদীয় বামদের প্রধান প্রবক্তা সিপিআই(এম)-এর ওপরেই মূলত জোর দেব।

পচনের সূচনা

বেশির ভাগ বিশ্লেষকই সিপিআই(এম)-এর পরাজয়ের কারণ খুঁজছেন ২০০৬-০৭ সালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে তাদের আত্মহত্যাসুলভ কার্যকলাপের মধ্যে। আর তাদের পতনের ইঙ্গিত দেখছেন তার পরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ও আরও পরবর্তীকালে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে। অন্যভাবে দেখলে, তাঁরা মনে করেন যে বামফ্রন্টের শাসনের শেষ পর্যায়েই (২০০৬-২০১১ সালে) কেবল সিপিআই(এম) বড় বড় ভুল করে, যার ফলে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমার বক্তব্য এই যে, এই বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে হবে এর অনেক আগে থেকে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন বহুজাতিক নির্দেশিত শিল্পায়নকে জোর করে সন্দিহান কৃষকদের জোর করে গেলাতে গেলেন তার অনেক পূর্ববর্তী সময় থেকে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম ছিল কফিনের শেষ পেরেক। অনেক বছর ধরে বিভিন্ন কারণে জনগণের যে রাগ ও হতাশা জমা হচ্ছিল, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম তাতে আগুন লাগালো।

প্রকৃতপক্ষে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে— তবে সেগুলি ছিল কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমিত, তেমন প্রচারও পায়নি সেগুলি। তার একটি ছিল মানবাধিকারের প্রশ্নে। সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার যদিও সব রাজনৈতিক বন্দীদের (যাদের সিংহভাগ ছিল তাদের পূর্বতন রাজনৈতিক বৈরী নকশালপন্থীরা) মুক্তি দেওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রেখেছিল, সরকারের নিজেদের গড়া দুটি কমিশন, শর্মা সরকার কমিশন ও হরতোষ চক্রবর্তী কমিশন যাদের ১৯৭০ সালের গোড়া থেকে শুরু করে জরুরি অবস্থা পর্যন্ত অত্যাচার চালানোর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিল সেই পুলিশ অফিসারদের সরানো বা শাস্তি দেওয়া থেকে তারা বিরত থাকে। কমিশনগুলি পুলিশ প্রশাসনের সংস্কারের যে সুপারিশ করেছিল তা না মেনে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (মন্ত্রকটি ছিল প্রবীণ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে) ঐ পুলিশবাহিনীর পুরনো ব্যবস্থাকেই জোরদার করে, গণ আন্দোলনকে দমন করতে সেই কুখ্যাত অফিসার ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের ব্যবহার করে।

মরিচঝাঁপি ও তারপর

এসবের প্রথমদিকের একটা দৃষ্টান্ত হলো ১৯৭৯ সালে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার দু বছর পর, মরিচঝাঁপিতে পুলিশ নামানো। আগে বামরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবে। এই প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবার (আগের কংগ্রেস সরকার যাদের মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়েছিল) সুন্দরবনে এসে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু আগের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বাম সরকার তাদের গ্রেপ্তার করে, জোর করে তাদের দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু বেশ কিছু পরিবার পুলিশের বেষ্টনী থেকে পালিয়ে গিয়ে সুন্দরবনের ঘন অরণ্যের মধ্যে মরিচঝাঁপিতে পৌঁছয়, জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি গড়ে, কৃষিকাজ শুরু করে।

বামফ্রন্ট সরকার তাদের অরণ্য আইনের মতো বিভিন্ন

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

সরকারি আইনভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করে, অভিযুক্ত করে বিখ্যাত রয়াল বেঙ্গল টাইগারের সুরক্ষা বিপন্ন করার দায়ে! এই সব উদ্বাস্তুদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ১৯৭৯ সালে মে মাসে তারা একটি পুলিশি অপারেশন চালায়— বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ ও শিশু নিহত হয়, অভিযোগ যে তাদের দেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বহুদিন চাপা থাকা এই ইতিহাস রস মল্লিকের তথ্যসমৃদ্ধ রচনা 'রিফিউজি সেটেলমেন্ট ইন ফরেস্ট রিজার্ভস: ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিসি রিভার্সাল অ্যান্ড দি মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার'-এ (দি জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিস, খণ্ড ৫৮, সংখ্যা ১) প্রকাশিত হয়। এর পরের বছরগুলিতে পুলিশকে দেখা যায় যখন-তখন গুলি চালাতে, গণবিক্ষোভের সবরকম বহিঃপ্রকাশ দমন করতে যারা সবসময় তৈরি।

১৯৮০-৮১, এই দুই বছরেই পুলিশের গুলিচালনার অন্তত ২৪৮টি ঘটনা ঘটে আর তাতে নারী-শিশু সহ ৬২ জন নিহত হয়। একই সময়কালে, পুলিশ লকআপ ও জেলগুলিতে বিচারাধীন বন্দী হত্যা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়— যা জরুরি অবস্থার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। বামফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় দফার রাজত্বের শেষাশেষি অবস্থা এমন এক জায়গায় পৌঁছে যায় যে ১৯৯২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ডি কে বাসু হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন, সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি তাদের পুলিশ হেফাজতে অত্যাচার ও হত্যা বন্ধ করার জন্য কঠোরভাবে বিধিনিষেধ মেনে চলতে বলেন। কিন্তু মানবাধিকার নিয়ে সিপিআই(এম)-এর সংবেদশীলতার অভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদের পরিচালিত সরকার এই নিষ্ঠুর পুলিশদের পাশে দাঁড়ায়, হাইকোর্টের এই সুপারিশগুলিকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে।

১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট *বাসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য* কেসটিতে রায় দেয়। তাতে বিচারপতি বাসুর বক্তব্যকেই মূলত সমর্থন করা হয়; গ্রেপ্তার, জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের ১১ টি শর্ত দেওয়া হয়।

কৃষি ক্ষেত্র

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ভয়ানক বিশ্রী রেকর্ড করলেও কৃষি ক্ষেত্রে কিন্তু সিপিআই(এম) তার শাসনের প্রথম পাঁচ বছরে দারুণ ভালো কাজ করে। কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়, ভাগচাষীদের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়, কৃষিমজুরদের মজুরি বাড়ানো হয়, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। কিন্তু ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকেই তারা এক ধরনের কানাগলিতে পৌঁছে যায়। (ভূমি সংস্কারের ফলে পাওয়া) জোত খুব ছোট হওয়ার ফলে জোত থেকে প্রাপ্ত আয় যে অপর্যাপ্ত হবে সেটি আগে থেকে অনুধাবন করতে না পারার ফলে, এইসব ছোট চাষিদের সাহায্য করতে জন্য কৃষি উপকরণ ও পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজনকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে ও বেকার গ্রামীণ যুবকযুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা স্থবিরতা দেখা দিল।

এমন নয় যে আগতপ্রায় এই সংকটের চিহ্নগুলি সিপিআই(এম) নেতৃত্বের নজরে পড়ে নি। ১৯৮২ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর সে বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শাসক বামফ্রন্টের শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ভক্তিভূষণ মন্ডল এই বলে সতর্ক করেন যে (জমি পুনর্বণ্টনের ফলে জমির মালিকানা পাওয়া) ছোট ছোট জোতের মালিকরা সংকটে পড়ছেন, কারণ চাষের জন্য যে পরিমাণ দামি দামি উপকরণ ব্যবহার করতে হচ্ছে চাষ থেকে ততটা আয় হচ্ছে না। তিনি বলেন যে অন্য কাজের মাধ্যমে বাড়তি টাকা রোজগার না করতে পারলে তাদের টিকে থাকা মুসকিল হয়ে পড়বে। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব এসব সতর্কতায় কান দেননি। এর ফলে গত দু-তিন দশকে দিন দিন আরো গরিব হয়ে পড়া এই বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ সিপিআই(এম) থেকে দূরে সরে গেলেন।

পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা

সিপিআই(এম)-এর দ্বিতীয় কৃতিত্ব— পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা— সিপিআই(এম)-কে সত্যিই গ্রামের মানুষের সমর্থন এনে দিয়েছে। এই প্রথম এরা আইনি বাধা ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের বাধা পেরিয়ে গ্রামের নীতিগত সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি অর্জন করলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই এটি স্থানীয় সিপিআই(এম) ও বামফ্রন্টের অন্য শরিক দলগুলির নেতা ও কর্মকর্তাদের আধিপত্যাধীন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। গ্রামের মানুষের সামাজিক কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করার সরকারি টাকা পঞ্চায়েত থেকে চলে যেতে থাকল পার্টি অফিস ও নেতাদের নিজেদের বাড়ি তৈরির খাতে (চারধারের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মাঝখানে এই বাড়িগুলি একেবারেই বেমানান, নির্বাচনের প্রাক্কালে বাম-বিরোধী বিক্ষোভের সময় এগুলি যে জনগণের ক্রোধের শিকার হবে, তা বোঝা কঠিন নয়।

এইসব প্রবণতা ২০০০-২০১১ সময়কালে হঠাৎ করে তৈরি হয় নি। পঞ্চায়েতগুলি যেভাবে গঠিত হচ্ছিল তার মধ্যেই এই দুর্নীতির বীজ লুকিয়ে ছিল। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট আমলে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআই(এম) ও তাদের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে যে প্রার্থীরা নির্বাচিত হন তাদের বেশির ভাগেই এসেছিলেন সচ্ছল কৃষক ঘর (৫০.৭ শতাংশ) ও স্কুলশিক্ষকদের (১৪ শতাংশ) মধ্য থেকে। গ্রামীণ গরিবদের (যারা নাকি বামদের মূল ভিত্তি) মধ্যে ভাগচাষিরা ছিলেন মাত্র ১.৮ শতাংশ আর খেতমজুররা ৪.৮ শতাংশ। পঞ্চায়েত-প্রধানরা যে শীঘ্রই ভীতি প্রদর্শন ও দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ গরিবদের শোষণ করতে শুরু করবেন, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এই শ্রেণীবিভাগ

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

দেখলে তা বোঝা কঠিন হয় না।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার এই বিকৃতির বিষয়টিও বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বের অগোচর ছিল না।

১৯৮২ সালেই তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় (আরএসপি) রাজ্যের সেক্রেটারিয়েট থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করেন যে বেশির ভাগ পঞ্চায়েত সদস্যই দুর্নীতিগ্রস্ত। তিনি আরও বলেন যে ৩২৪৩টি পঞ্চায়েতের মধ্যে অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে মাত্র ১১৬০টি। (১৯ জুলাই, ১৯৮২)।

পরবর্তী বছরগুলিতে বাম-পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে নৈতিক ও রাজনৈতিক স্খলন আরো বাড়ে। এই পঞ্চায়েতগুলির সিংহভাগ ছিল সিপিআই(এম)-এর হাতে।

শিল্প ক্ষেত্র

এবার আসা যাক শিল্প ক্ষেত্রে। সিপিআই(এম)-এর কর্মসূচিতে শিল্প শ্রমিকদের বলা হয়েছে প্রস্তাবিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা।

কিন্তু এই সময়কালে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, হাজার হাজার শ্রমিক পথে বসেছে, আর বামফ্রন্ট সরকার নীরব দর্শক হয়ে থেকেছে, এমনকি শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলিকে সমবায় তৈরি করে কারখানা চালানোর জন্যও এতটুকু সাহায্য করেনি। শ্রমিক অঞ্চলে যে সিপিআই(এম) হেরেছে, তাতে তাই আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের শিল্প নীতিতে পুরনো কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে শ্রমিকদের চাকরি চলে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে এসেছে নতুন নতুন দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানি, যাদের হাতে শ্রমিকদের নতুন করে চাকরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই— এই শিল্পনীতির জন্য শ্রমিকরা বামফ্রন্টকে শাস্তি দিয়েছে।

শিল্পবিবাদ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের রেকর্ড দেখা যাক। ১৯৮০-র দশকেই শ্রমিকরা যখনতখন ধর্মঘট করা থেকে বিরত থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উপদেশ মেনে নিলেন, কিন্তু তিনি কারখানা মালিকদের ক্লোজার ও লকআউট করা মেনে নিলেন।

১৯৮১ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে ধর্মঘটের সংখ্যা ৪৩ থেকে কমে হলো ২৯। কিন্তু সেই একই সময়কালে ৫৪টি কারখানায় লকআউট ঘোষণার ফলে ৫৩০০০ শ্রমিকের জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়লো, ১৩টি কারখানায় শিল্পপতিরা ক্লোজার ঘোষণায় কাজ হারালো ১২৩০০ শ্রমিক (*দেবাশিস ভট্টাচার্য, বামপন্থীরা মহাকরণের মন্ত্রী হয়ে যা করেছেন*, কলকাতা, ১৯৮৩)। আজও একই জিনিস চলছে। লেবার ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট হয়েছে ২৬টি, আর লকআউট ১৮২টি। এর থেকে বোঝা যায় যে সিপিআই(এম) রাজত্বে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দরকষাকষির জমিটা ছিল অসম। সিপিআই(এম) যে বর্তমানে বহুজাতিক সালিম বা ভারতীয় শিল্পকুবের টাটা ও জিন্দালদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তার মূল পাওয়া যায় ১৯৮০-র দশকে তাদের নেওয়া শিল্পনীতিতে।

এইভাবে বছরের পর বছর গ্রামীণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে, শিল্প শ্রমিক শ্রেণী এক ধরনের বেইমানি বোধ করেছে, শহরের গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে, আর এ সব সম্পর্কে উদাসীন আত্মতৃপ্ত সিপিআই(এম) নেতৃত্ব কলকাতার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের দপ্তরে বসে থেকেছেন। শুধু সংবাদপত্রগুলিই নয়, দলের বর্ষীয়ান নেতারা, বামপন্থী বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদরা (সিপিআইএম দলের বাইরের) যখন আগতপ্রায় বিপর্যয়ের জন্য সতর্ক করেছেন (প্রায়ই ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার পাতায়) এই নেতারা তাতে কান দেন নি।

দাম্ভিক মেজাজে সংবাদপত্রের রিপোর্টকে তারা 'বুর্জোয়া প্রচার' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের নিজেদের দলের বর্ষীয়ান নেতা বিনয় চৌধুরীর (প্রথম বামফ্রন্টের মন্ত্রী হিসাবে যিনি ভূমি সংস্কারের সূত্রপাত করেন) সতর্কতাবাণী অন্তত তাদের শোনা উচিত ছিল।

১৯৯০-এর দশকে মৃত্যুর আগে তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর পার্টি সংগঠনের নিন্দা করে বলেন যে পার্টিতে এখন সেই সব নেতাদের আধিপত্য, 'কনট্রাক্টর আর প্রোমোটারদের' সঙ্গে যাদের ওঠাবসা।

কিন্তু পার্টি কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন যে যতক্ষণ তারা পার্টির ভাণ্ডারে নিয়মিত মাসিক অর্থ জুগিয়ে চলবে ততক্ষণ জেলা স্তরের পার্টি কর্মকর্তাদের কনট্রাক্টর ও প্রোমোটারদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কমিশন নেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। শহরে এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভকে অগ্রাহ্য করে সিপিআই(এম) নেতারা ভেবেছিলেন যে ৩০ বছর আগে তারা যা শুরু করেছিলেন সেই ভূমিসংস্কারের জন্য কৃতজ্ঞতার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে তারা তাদের সবচেয়ে বড় ভোটব্যাংক, গ্রামের কৃষকদের সমর্থন, চিরকাল ধরে রাখতে পারবেন। কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে, ভূমি সংস্কারের কাজটাও ১৯৮০-র দশকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯০-এর দশকে গ্রামে অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দেয়। '৮০-র দশকে করা ভূমি সংস্কার ২০০০-এর দশকে পরিণত হয় সিপিআই(এম)-এর প্রচারের অস্ত্রে। এই কর্মসূচি গ্রামীণ দরিদ্রদের একটি প্রজন্মের ক্ষমতায়ন ঘটায় কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির কোনো উপায় তুলে দেয় না— এ অবস্থায় সিপিআই(এম)-এর সেই আগেকার কথা বলে বাঁচার প্রচেষ্টাকে যে বাংলার গ্রামবাসীরা "করে পোলাও খেয়েছি, এখনো হাতে তার গন্ধ লেগে আছে" বলে ব্যঙ্গ করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মুসলিমরা

সিপিআই(এম)-এর আরেকটি প্রথাগত সমর্থককুল— সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ও— এবার তাদের পরিত্যাগ করেছে। অথচ

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সবসময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে নিরাপদ দুর্গ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ২০০২ সালে গুজরাটে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার এক শিকারকে আশ্রয় দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য হিসাবে পরিচিত যেখানকার বাম সরকার সবসময় দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছে (১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনার সময়ে অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে)।

মমতা ব্যানার্জী যদিও কিছুদিন এনডিএ সরকারের অংশ ছিলেন, যে সরকারের আমলে গুজরাতে মুসলিমদের নিধন করা হয়, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা কিন্তু এবার সাধারণভাবে তাঁর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এটা কি তাঁদের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের উদাসীনতার— সাচার কমিটির রিপোর্টে যার প্রমাণ মিলেছে— বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ? তাঁদের অদূরদর্শী নীতির বশবর্তী হয়ে সিপিআই(এম) নেতারা ভেবেছিলেন যে তসলিমা নাসরিনের বই নিষিদ্ধ করে আর তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়ানোর মৌলবাদী দাবি মেনে নিয়েই তারা মুসলিম ভোটারদের খুশি করতে পারবেন। অন্যদিকে শিল্পপতি অশোক তোডি যখন তাঁর মেয়ে একজন সাধারণ মুসলিম রিজওয়ানুর রহমানকে বিয়ে করার বিরোধিতা করলেন, তখন উত্তর ভারতের শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে খুশি করতে ও পার্টির ভাণ্ডারে নিয়মিত পয়সা আসা সুনিশ্চিত করতে তারা প্রশাসনকে অশোক তোডির সাহায্যে লাগালেন। অভিযোগ যে, কলকাতার বড় বড় পুলিশ অফিসাররা রিজানুর রহমানকে ভয় দেখান, তাঁকে তাঁর স্ত্রী প্রিয়াংকার থেকে আলাদা করে রাখেন। ২০০৭ সালে, এর পর পরই, রিজওয়ানুরকে পাওয়া গেল রেললাইনে, মৃত অবস্থায়।

অনুসন্ধানে এই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে পুলিশ অফিসাররা ও তোডি পরিবার তাঁকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দিতে অস্বীকার করলেন। এতে যে কেবল রিজওয়ানুরের পরিবারই বিরোধী হয়ে উঠল তাই নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই মনে করলেন যে সিপিআই(এম) ধনী শিল্পপতি তোডিদের রক্ষা করছে। মমতা ব্যানার্জী এই সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করলেন। রিজওয়ানুরের ভাই রুকবানুরকে তিনি সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালেন।

প্রশাসনকে পার্টির নিয়ন্ত্রণে আনা

পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) প্রশাসনের প্রসঙ্গে আসি। সবাই আশা করেছিল যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয় আসা একটি সমাজগণতান্ত্রিক পার্টি হিসাবে সিপিআই(এম) অন্তত সংসদীয় ব্যবস্থার দুটি নিয়ম মেনে চলবে। কিন্তু যে কোনও ভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে এই পার্টি তা করে নি। প্রথমত তারা কলকাতার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে তাদের সদর দপ্তরকে একটি সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতা-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলল। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের কর্মীদের পরিবর্তে জেলা ও গ্রাম পর্যায়ের পার্টি-কর্মকর্তাদের প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন প্রশাসনের দায়িত্ব হাতে নিতে উৎসাহিত করলো। (প্রশাসনযন্ত্রকে হিসেব করে ক্রমাগত ঠুঁটো করে দেওয়ার চমৎকার একটি চিত্র পাওয়া যাবে বামফ্রন্ট আমলে কাজ করা এক বরিষ্ঠ আমলা কল্যাণ চৌধুরীর লেখায়—*হোয়েন দ্য পেন্ডুলাম স্টপ্‌স: ডেথ অফ বেঙ্গল ব্যুরোক্রাসি*, কলকাতা: নচিকেতা পাবলিসার্স)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মতো নামী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনকে নিজেদের তাঁবে আনতে দিয়ে সেগুলি নিজেদের লোক (প্রায়শই অকর্মণ্য) দিয়ে ভর্তি করে, এসব প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের দৈনন্দিন প্রশাসন চালানোর ভার নিতে দিয়ে, সিপিআই(এম) নেতা ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পরিকাঠামোটাই ধ্বংস করে ফেললো।

১৯৯০-এর দশকে যখনই কলকাতায় গেছি তখনই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অপেক্ষমান রোগিদের অভিযোগ শুনেছি যে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতে হলে সিপিআই(এম)-এর ইউনিয়নকে টাকা দিতে হয়। কলকাতা ও দিল্লিতে সিপিআই(এম)-এর বন্ধুদের আমি এই বিপজ্জনক প্রবণতা নিয়ে সতর্ক করেছি। কিন্তু তাঁরা এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

বুর্জোয় সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে গেলে কোনো সমাজগণতন্ত্রী পার্টির আর একটি দায় থাকে— গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সহ্য করার দায়। কিন্তু সিপিআই(এম) এই নিয়মটি মানে নি, নিজেদের পার্টিগত স্বার্থ সিদ্ধ করতে গিয়ে তারা ঐ গণতান্ত্রিক স্থানটিকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে, রাজনৈতিক বিরোধীদের শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে পরপর জয়লাভের সময় অভিযোগ উঠেছে যে সিপিআই(এম)-এর ভোট আসলে কমেছে (জনপ্রিয়তা কমা থেকে এটি আন্দাজ করা যায়), আর সেই কমে যাওয়া ভোটের স্থান নিচ্ছে রিগিং (তাদের মস্তানরা ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়, তাদের বদলে পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচনী অফিসাররা ব্যালট-পেপারে শাসক পার্টির প্রার্থীর পক্ষে ছাপ দিয়ে দেয়)।

এরকম ভীতিপ্রদর্শন যে ঘটে (আমার কলকাতাবাসী বন্ধুরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে, তারা বলেছে যে গত চারটি বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ভোট দিতে দেওয়া হয় নি) সেটা মেনে নিয়েও আমার মনে হয় যে সিপিআই(এম) ঐ নির্বাচনগুলি শুধু রিগিং করে জেতে নি। তখনও তাদের একদল ভক্ত ছিল, আর গ্রামের কিছু মধ্যপন্থী ভোটারকে তারা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজেদের পক্ষে টানতে পারত, কারণ বিকল্প কোনো পার্টি ছিল না। (১৯৯০-এর দশকে তাদের কাজকর্ম নিয়ে ক্রমবর্ধমান হতাশার পরও) পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর পরপর বিজয় ছিল একই সঙ্গে জোর খাটানো ও বোঝানোর ফল।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

দুটি কারণে ২০১১ সালের নির্বাচনে এই দ্বিমুখী নীতি কাজ করলো না। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন কমিশন সিপিআই(এম)-এর জোর খাটানোর, ভয় দেখানোর যন্ত্রের ওপর রাশ পড়ায়। দ্বিতীয়ত, সিপিআই(এম)-এর বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করার প্রচেষ্টা গ্রামীণ ভোটারদের তাদের পক্ষে টানতে সক্ষম হয় নি, কারণ ভোটাররা মনে করেছেন যে এবার একটি বিকল্প আছে, তৃণমূল।

সিপিআই(এম)-এর ভবিষ্যৎ

সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তাদের রাজ্য ইউনিট, কেউই পশ্চিমবঙ্গে তাদের পরাজয় নিয়ে কোনো গভীর চিন্তাভাবনার বা পার্টির কাজকর্মের ধরনে কোনো বড় ধরনের বদল আনার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছেন না। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও পার্টির সোচ্চার নেতা বিমান বসু নীরবতা পালন করছেন। সিপিআই(এম)-এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রকাশ কারাট গত লোকসভা নির্বাচন ও বর্তমান রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের কারণগুলির জন্য নিজেকে দায়ী করতে রাজি নন। এটা পরিষ্কার যে সম্পূর্ণ পরাভূত হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব পদত্যাগ করবেন না। পশ্চিমবঙ্গে এই পার্টির কর্মীবাহিনীর মধ্যে ভাড়াটে গুন্ডারা (যাদের হার্মাদ বলা হয়) এখন নতুন শাসকদের আশ্রয় নিতে চাইবে। মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের মধ্যেকার যারা সুবিধাবাদী তারা এখনই তৃণমূলের অফিসে লাইন দিচ্ছে। আর ট্রেড ইউনিয়নে ও কৃষকফ্রন্টে যে কয়েকজন মতাদর্শগতভাবে অনুপ্রাণিত পুরনো কর্মী আছেন, পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার মতো মনোবল এখন তাদের নেই।

শেষোক্তরা তাঁদের নিজেদের সংগঠনে এমন কোনো নেতা পাচ্ছেন না যারা নয়া দিল্লীর নেতাদের জায়গা নিতে পারবেন। ৩০ বছরের শাসনের পর ১৯৬০-এর দশকের ছাত্র-নেতারা পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলেন। ১৯৬৪ সালে শ্রমিক ও কৃষকদের সেবার কথা বলে শেষ পর্যন্ত একটি মধ্যবিত্ত বাবুদের আধিপত্যাধীন পার্টিতে পরিণত হওয়া— পার্টির এই পচন চোখে দেখার পর এইসব সৎ কর্মীরা খুব শীঘ্রই বসে যাবেন, অর্থাৎ রাজনৈতিক কাজ থেকে অবসর নেবেন। অন্যভাবে বললে, সিপিআই(এম) পার্টিতে সেইসব নেতারাই থেকে যাবেন যারা আগের ভুল স্বীকার করতে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও অপরাধীদের পার্টি থেকে তাড়াতে অস্বীকার করছেন। আগামী দিনগুলিতে এই পার্টিটি পশ্চিমবঙ্গে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। পার্টির জাতীয় নেতৃত্বকে আরো মৌলিক একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। নির্বাচনের ওপর এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে তার জন্য জনমোহিনী নীতি ও সুবিধাবাদের আশ্রয় নিতে হলে তাঁরা নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া ঠেকাবেন কী করে? সমাজগণতন্ত্রী একটি পার্টি হিসাবে তাঁদের ভূমিকার (ক্ষমতায় থেকে ও ক্ষমতার বাইরে) সাথে তাদের স্তালিনীয় স্বৈরাচারের পথে চলা গণতন্ত্র-বিরোধী ভূমিকাকে মেলাবেন কী করে?

এখান থেকে আমরা এসে পড়ি ভারতের রাজনীতিতে সাধারণভাবে বামপন্থীদের ভবিষ্যতের তাৎপর্য প্রসঙ্গে। এখন দরকার সিপিআই(এম) ও বাম মতাদর্শের মধ্যে স্পষ্ট ফারাক করার। পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর কাজকর্ম থেকে এটা পরিষ্কার যে এই পার্টিটা কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা থেকে ক্রমাগত সরে গেছে এবং শেষ এই অধিকারকে তাকে শিল্পপতি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পায়ে বলি দিয়েছে। গরিবদের বিরুদ্ধে কুখ্যাত পুলিশবাহিনীকে সাহায্য করে তারা নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকে পিঠ ফিরিয়ে থেকেছে। জাতীয় স্তরেও তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার ব্যর্থ চেষ্টায় এই পার্টিটি মতাদর্শ বিসর্জন দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের সঙ্গে জোট গঠন করার চেষ্টা করে গেছে। সিপিআই(এম) তাই বামপন্থী দল হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। এই পার্টিটিকে তাই দেখা উচিত অন্য সব সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলির (জাত-ভিত্তিক বা আঞ্চলিক দলগুলি, যারা শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসার জন্য তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে কাজ করে) মতো করে— যাদের কোনও ব্যাপক মতাদর্শগত বিশ্বাস নেই।

বামপন্থীদের কাছে তাৎপর্য

ভারতের বামপন্থী শক্তিগুলির নতুনভাবে দাঁড়ানো দরকার। প্রথমেই দরকার সিপিআই(এম)-এর আধিপত্য অস্বীকার করা, এবং কৃষক, শিল্পশ্রমিক ও সমাজের অন্যান্য বিত্তহীন শ্রেণীগুলির সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করে জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনা। ভারতের এই নতুন বামপন্থীরা হতে পারে বামপন্থী সংসদীয় দলগুলি (বামফ্রন্টের ছোট দলগুলি, যারা বিগ ব্রাদার সিপিআইএম-র সমালোচনা করছিলেন) ও অ-সংসদীয় আন্দোলনগুলির একটি ব্যাপক জোট। মূলধারার রাজনীতির বাইরে যেসব গণ-আন্দোলন চলছে (যেমন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, পসকো-বিরোধী আন্দোলন) তাদের সঙ্গে জোট করা, নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করে যারা তাদের সমর্থন করা, মাওবাদীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা, এবং এই সমস্ত শক্তির সাহায্য নিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের এক বিকল্প রণনীতি গড়ে তোলা। সিপিআই(এম)-এর সদস্য ও সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদরা, যাদের জন্য সিপিআই(এম)-এর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে, তারা কি ঐ পার্টিটিকে তাঁদের মতাদর্শের একমাত্র ধারক-বাহক মনে করা বন্ধ করে এই নতুন বাম আন্দোলনের জন্য প্রচারে তাঁদের শক্তি ব্যয় করবেন?

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৪ জুন ২০১১ থেকে গৃহীত

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বিশ্বজোড়া খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও খাদ্য সংকট : একটি পর্যবেক্ষণ

অপরাজিতা মুখার্জী

১। খাদ্য সংকটের প্রকৃতি

কয়েক বছর যাবৎ সারা বিশ্বে খাদ্যসংকট ও খাদ্য অনিশ্চয়তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। গত ২০০৭-২০০৮-এর খাদ্য পরিস্থিতি খাদ্য সংকটের আশু সম্ভাবনার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। বিশ্বের খাদ্যের মজুত ভাণ্ডারের দ্রুত অবক্ষয়, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যসামগ্রীর দামের বৃদ্ধির হারে অতি দ্রুত গতি এবং এশিয়া ও সাহারা-নিম্নবর্তী আফ্রিকার খাদ্য আমদানি-নির্ভর দেশগুলিতে ক্ষুধিত মানুষের সংখ্যার বিপুল বিস্তার ও এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর ৩০টি দেশে খাদ্য-দাঙ্গা—এইসব ঘটনা বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট ও খাদ্য অনিশ্চয়তার বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত সংস্থার প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করে। চিরাচরিত নিয়মে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি একদিকে বিশেষভাবে সংকটে-পড়া দেশগুলিকে কীভাবে সাহায্য করা যেতে পারে সে বিষয়ে নানা মতামত দিতে থাকে, অন্যদিকে এই সব দেশগুলিকে কীভাবে সংকট থেকে বের করে আনা যেতে পারে তার জন্য বিশেষ কয়েকটি খাদ্য সংক্রান্ত ও কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত আচরণবিধি জারি করে।

আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেবে ২০০৭ সালে সারা বিশ্বে ৯২ কোটি ৩০ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষ ছিল— ১৯৯০-৯২ সালের তুলনায় ৮ কোটি বেশি। স্থায়ী ক্ষুধার সবচেয়ে বেশি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে ২০০৩-২০০৫ ও ২০০৭-এর মধ্যে। এই দু বছরের মধ্যে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ নতুন করে ক্ষুধিতদের দলভুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি এর সবথেকে বড় কারণ বলে মনে করা হয়।

খাদ্য মানুষের সবচেয়ে মৌলিক একটি প্রয়োজন, তাই খাদ্য বিষয়টি মানুষকে তথা দেশ বা জাতিকে নির্ভরশীল করে রাখা ও রাজনৈতিক ভাবে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করার সবথেকে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

পুঁজিবাদী দুনিয়া বরাবরই এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য এই হাতিয়ারটি খুব কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করে এসেছে। যতদিন পর্যন্ত এইসব দেশগুলির খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকে ততদিন পর্যন্ত সাহায্য ও রপ্তানির মাধ্যমে খাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখার সুযোগে এইসব দেশগুলির ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ, ‘পরামর্শ’ ও শর্তাবলী চাপানোর উপায় থাকে, যার সুযোগে বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলি নানাভাবে নিজেদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে; বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষমতাগোষ্ঠীর বিন্যাসে নিজ নিজ তুলনামূলক অবস্থানকে জোরদার করার জন্য ও পশ্চাৎপদ নির্ভরশীল দেশগুলিকে নিজেদের গোষ্ঠীর অনুগামী করে রাখার জন্য ক্ষুধাকে তারা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। পশ্চাৎপদ দেশগুলি খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠলে খাদ্যাভাব নিয়ে এই ধরনের সরাসরি রাজনীতির সুযোগ কমে যায়। তখন এইসব দেশগুলির গোটা কৃষিব্যবস্থা ও কৃষিনীতিকে আন্তর্জাতিক সাধারণ নিয়মনীতির আওতায় এনে ফেলে এই সব দেশের কৃষি ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক বাজারের টানাপোড়েনের উপর নির্ভরশীল করে তুলে খাদ্য বিষয়ে অনিশ্চয়তাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়।

অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফা ও ভোগবাদ পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। এর ফলশ্রুতিতে মানুষের ভোগের ধরনের যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে, পুঁজিবাদের চরম স্তরে এসে তা উৎপাদনের প্রাকৃতিক উপকরণগুলির অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার, জমিসমেত অন্যান্য আবশ্যিক প্রাকৃতিক উপকরণগুলির দ্রুত অবক্ষয় ঘটায়। অন্যদিকে এই সব উপকরণের বেশি লাভজনক ব্যবহারের লক্ষ্য খাদ্যশস্যের মতো অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক উৎপাদনকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে ফেলে। এর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়ের মানুষের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যশস্যের ব্যবহার কমালেও খাদ্যশস্যের পরোক্ষ ব্যবহার ও চাহিদা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এর সঙ্গে জৈব জ্বালানি-শিল্পের বিপুল বিস্তার খাদ্যশস্যকে জৈব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। এসব কিছুর ফলে খাদ্যশস্যের যোগান ও চাহিদার মধ্যে বিরাট অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে আমরা ২০০৫-পরবর্তী সময়কালে ক্রমাগত এক কঠিন খাদ্য পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছি। ২০০৮-২০০৯ সালে যে সংকট চরম আকার নিতে যাচ্ছিল ২০১০-এ তার কিছুটা প্রশমন ঘটলেও ২০১১ সালে পৌঁছে আবার আমরা সেই কঠিন খাদ্য পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছি। ২০০৮-২০০৯-এ খাদ্যশস্যের দামের সূচক যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, ২০০৯-পরবর্তী সময়ে তা কিছুটা কমে এলেও ২০১১ সালের মে মাসে তা পূর্ববর্তী চূড়ান্ত বিন্দুটিকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যায়। ২০০৯ সালে পৃথিবীতে ক্ষুধিত অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা ছিল ১০০ কোটির বেশি। আবার অতিসম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তরের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার ফলে বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

আরও ৪৪০ লক্ষ মানুষ নতুন করে ক্ষুধিতদের দলভুক্ত হতে চলেছে। ২০০৭-২০০৮ সালের খাদ্য পরিস্থিতি এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকার নানা দেশে যে খাদ্য-দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল, ২০১১ সালে আবার অনুরূপ সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠছে।

খাদ্য উৎপাদনের নিম্নমুখী প্রবণতা ও খাদ্য-মূল্যবৃদ্ধি

১৯৬১-১৯৬৫-র মধ্যে 'সবুজ বিপ্লব' যে নতুন প্রযুক্তি এনেছিল তার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার, জল ও নতুনভাবে তৈরি উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রয়োগে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হারে লক্ষ্য করার মত বৃদ্ধি ঘটেছিল— যদিও এই নয়া প্রযুক্তির নানান দীর্ঘকালীন কুফল নিয়ে সংশয় রয়েছে। সেচের প্রসার ঘটিয়ে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ আমাদের মত দেশের কৃষির পক্ষে অধিকতর সুফল দিতে পারত এমন একটি ধারণা অর্থনীতিবিদদের একটি বড় অংশের মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজ-মান। যাইহোক, সারা পৃথিবীতে মাথাপিছু গড় খাদ্যশস্যের উৎপাদন (বাৎসরিক) ১৯৬১-১৯৬৫-তে ২৭১ কেজি থেকে বেড়ে ১৯৬৭-১৯৭০-এ দাঁড়ায় ২৯৫ কেজি। এই বৃদ্ধির ঝোঁক পরবর্তী প্রায় দু দশক বজায় থাকার ফলে ১৯৮৫-তে মাথাপিছু গড় উৎপাদন ৩৩৪ কেজিতে পৌঁছায়। কিন্তু ১৯৮৫-র পর থেকে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের বৃদ্ধির হারে নিম্নগতি দেখা দিতে থাকে। ১৯৬১-১৯৮৫-র মধ্যে যেখানে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫১%, ১৯৮৫-র পরবর্তী সময়ে সেই হার কমে ১.০৯%-এ এসে দাঁড়ায়। এর ফলস্বরূপ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ৮ বছরে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় উৎপাদন কমে ৩১৫ কেজিতে নেমে আসে। চাল ও গম এই দুটি প্রধান খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় উৎপাদন ১৯৮৫ সাল অবধি বৃদ্ধি পেতে থাকলেও ২০০০ সালের মধ্যে বৃদ্ধির গতি যথেষ্ট শ্লথ হয়ে আসে। ২০০০-পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ২০০৫-এর পরে, তা লক্ষণীয়ভাবে কমে আসে। উৎপাদনের এই নিম্নগতির পাশাপাশি সারা পৃথিবীতে খাদ্যশস্যের ব্যবহার প্রাথমিকভাবে কিছুটা কমলেও পরবর্তী সময়ে যোগান ও চাহিদার মধ্যে বিশাল ফারাক দেখা যায়। এই ফারাক ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার অতিদ্রুত ক্ষয় পেতে দেখা যায়। ২০০৬-২০০৭-এ এই মজুত ভাণ্ডার লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়। খাদ্যশস্যের বাৎসরিক ব্যবহারের পরিমাণের তুলনায় খাদ্য-শস্যের ভাণ্ডারের আয়তন অত্যন্ত কমে আসতে থাকে। বেশ কয়েক বৎসর ধরে খাদ্যশস্যের যোগান ও চাহিদার মধ্যে এই অসামঞ্জস্য চলতে থাকার ফলে ঘাটতির পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলে ও তার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের দামের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রদত্ত হিসেবে দেখা যায় এপ্রিল ২০০৬ ও এপ্রিল ২০০৭-এর মধ্যে যেখানে খাদ্যশস্যের দামে ৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে, সেখানে পরবর্তী ১২ মাসে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে ৪৫.৬ শতাংশ। নভেম্বর ২০০৭ ও মার্চ ২০০৮ এই পাঁচ মাসের মধ্যে চালের দাম দ্বিগুণ হয়, মার্চ ২০০৭-এর পরবর্তী বারো মাসের গমের দাম দ্বিগুণের বেশি বাড়ে। ২০০৬-এর পরবর্তী দেড় বছরে ভুট্টার দাম দ্বিগুণ হয়। ২০০২-২০০৪-এর গড় মূল্য সূচককে ১০০ ধরে খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (FAO) যে মূল্যসূচক তৈরি করেছে তা থেকে দেখা যায় ২০০৫-এর জানুয়ারিতে যেখানে খাদ্যশস্যের মূল্যসূচক ছিল ১০৪, ২০০৮-এর এপ্রিলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭৪.৩। পরবর্তী সময়ে ওঠানামার মধ্য দিয়ে খাদ্যশস্যের গড় সূচক কমে আসতে থাকে, কিন্তু ২০১০-এর নভেম্বর-এর পর থেকে এই সূচক ক্রমাগত বাড়তে থাকে ও এপ্রিল ২০১১-এ তা আবার ২৬৫.৪ স্পর্শ করে।

খাদ্যশস্যের যোগান ও চাহিদার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক, খাদ্যের মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস এবং খাদ্যশস্যের দামের বিপুল স্ফীতি, খাদ্য-দাঙ্গা— এই সমস্ত যেসব প্রবণতগুলি পর্যবেক্ষণ ক'রে ২০০৮ সালে বিশ্ব কৃষি সংস্থা বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতিতে আশু সংকটের সংকেত দিয়েছিল, ২০১১-তে আবার সেই সমস্ত সম্ভাবনাগুলি দেখা দিতে শুরু করেছে।

খাদ্য সংকটের কারণ

খাদ্য পরিস্থিতির এই সংকটজনক অবস্থার কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায়শই সমস্যার গভীরে না গিয়ে কয়েকটি আশু কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। ২০০৮-এর কঠিন খাদ্য পরিস্থিতির পিছনে যে কারণগুলি কাজ করেছিল তার মধ্যে প্রধান চারটি কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথম ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ খাদ্যশস্যের উৎপাদনে দীর্ঘকালীন হ্রাসের প্রবণতা। দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তনের ফলে উন্নত দেশগুলিতে বিপুল চাহিদা বৃদ্ধি। তৃতীয়ত, অপরিশোধিত খনিজ তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন ধরনের সার ও অন্যান্য উপকরণের দাম বৃদ্ধি। এবং চতুর্থত, জীবাশ্ম-জ্বালানির জায়গায় জৈব জ্বালানি ব্যবহারের বিপুল বৃদ্ধি। প্রথম দুটি কারণকে খাদ্য সংকটের দীর্ঘকালীন কারণ বলা যেতে পারে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনে দীর্ঘকালীন হ্রাসের প্রবণতাকে খাদ্য সংকটের একটি স্থায়ী কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। আর খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাসের দীর্ঘকালীন প্রবণতার পিছনে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে উন্নত ও উন্নয়ন-কামী পশ্চাৎপদ দেশগুলির মধ্যে কৃষিতে নতুন ধরনের শ্রমবিভাজন ও বিশেষীকরণের প্রবণতা। এই বিষয়গুলিতে যাওয়ার আগে আমরা খাদ্যসংকটের আশু কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও
জৈব জ্বালানি ব্যবহার সংক্রান্ত কারণ

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চরম ভোগবাদী সংস্কৃতির ওপর টিকে থাকে। একদিকে সমাজের ক্রমবর্ধমান অংশের মধ্যে নিত্য

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

নতুন ভোগ্যপণ্যের অসীম আকাbখা সৃষ্টি করেই পুঁজিবাদ পুঞ্জীভূত পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের উপায় সৃষ্টি করে। অন্যদিকে পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ সমস্ত ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহার করে চলে। এই দুই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকে। ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি এমনই এক প্রাকৃতিক সম্পদ যার ক্ষয় অপূরণীয়, অথচ যা বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনীতির পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। এর নির্বিচার ব্যবহার এবং ক্রমাগত নিঃশেষিত হওয়ার কারণে এর দাম যতই হু হু করে বেড়ে চলেছে, ততই তেল উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য আমেরিকা এবং ইউরোপের ক্ষমতাশালী দেশগুলির তৎপরতা বেড়ে চলেছে। খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে এই অশান্তির পরিবেশে বিকল্প হিসেবে জৈব জ্বালানির আবিষ্কার উন্নত দেশগুলির কাছে নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষিজাত শস্য এই নতুন শক্তির প্রধান উৎস। আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে এই নতুন বিকল্প তেল কয়েকটি বিশেষ সুবিধা এনে দিয়েছে। প্রথমত, তেলের এই নতুন উৎসটি এই সব দেশগুলির হাতে একটি বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে যার প্রয়োগ ক'রে আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের চাহিদা ও দামের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জিত হবে। এই ক্ষমতার বলে খনিজ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ও ঐ দেশগুলিকে চাপে রাখা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, পরিবেশ বিষয়ক কিয়োটো প্রোটোকলের নির্দেশ মানার পক্ষে এটি সহায়ক ভূমিকা নেবে, কারণ খনিজ তেলের বদলে এই জ্বালানির ব্যবহার গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদন কমাবে। তৃতীয়ত, এই ধরনের কৃষিপণ্যে যথেষ্ট ভরতুকি ও আর্থিক সহায়তা দিলেও তা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সভায় অন্যান্য সভ্যদের সমালোচনা ও আপত্তির বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে না। চতুর্থত, খাদ্যশস্যের জমি জ্বালানি শস্যের জন্য ব্যবহার করার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমলে বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের দাম বাড়িয়ে রাখা সম্ভব হবে; ফলে আমেরিকা ও ইউরোপের বহুজাতিক সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের লাভজনক ব্যবসা বজায় রাখতে পারবে। এই সব দেশগুলির পক্ষে তাদের কৃষি উৎপাদনকারীদের খাদ্যশস্যের বদলে জ্বালানি শস্য উৎপাদনে আরও বেশি উৎসাহ ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া অনেক বেশি লাভজনক। এর ফলশ্রুতিতে জৈব জ্বালানি শিল্পের বিপুল বিস্তার ঘটছে ও এই শিল্পে শস্যের ব্যবহার বেড়েই চলেছে।

উন্নত দেশগুলির পক্ষে জৈব জ্বালানির ব্যবহারের এই প্রক্রিয়ার ফলে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের জমি জ্বালানি শস্যের জমিতে রূপান্তরিত হয়। খোদ আমেরিকায় ২০০৭-২০০৮ সালে মোট শস্যের এক চতুর্থাংশই জৈব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ২০০৮-২০০৯-এ এই অনুপাতটি এক তৃতীয়াংশে গিয়ে দাঁড়ায়। ২০০২-২০০৩ সালে আমেরিকায় ২৭.১ মিলিয়ন টন শস্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ২০০৮-২০০৯-এ এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১০৮.৯৮ মিলিয়ন টন, যা আমেরিকার মোট শস্য উৎপাদনের ৩২.৮ শতাংশ, সারা বিশ্বের শস্য উৎপাদনের ১৫.৪ শতাংশ। খাদ্যশস্যকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের এই দ্রুত বৃদ্ধি শস্যের চাহিদা বিপুল পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে ও খাদ্যশস্যের লভ্যতা কমিয়ে দেয়। সারা বিশ্বে যে পরিমাণ শস্য কেনাবেচা হয় তার এক তৃতীয়াংশই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই শস্য খাদ্যশস্যের বাজারে বিক্রীত হলে বিশ্বের মানুষের খাদ্যশস্যের গড় লভ্যতা বছরে মাথাপিছু ১২.৪ কেজি বাড়তে পারত। কেবলমাত্র আমেরিকাতেই যে পরিমাণ শস্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা খাদ্যশস্য হিসেবে ব্যবহৃত হলে সারা পৃথিবীর মানুষের খাদ্যশস্যের গড় মাথাপিছু লভ্যতা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে। আমরা দেখেছি, ২০০০ সালে বিশ্বে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু বাৎসরিক গড় উৎপাদন ছিল ৩১৫ কেজি। এর থেকে জৈব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত শস্য বাদ দিলে পরিমাণটি ৩০০ কেজির নিচে এসে দাঁড়ায়। এর থেকে আবার পশুখাদ্য, বীজ প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্যভাবে নষ্ট অংশ বাদ দিলে পরিমাণটি আরো অনেক নিচে এসে দাঁড়ায়।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যয় ও দামের সঙ্গে অপরিশোধিত তেলের দামের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অপরিশোধিত তেল, সার ও নানা প্রকার রাসায়নিক কীটনাশক ইত্যাদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও যানবাহনের জন্য অপরিশোধিত তেলের প্রয়োজন হয়। সব মিলিয়ে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে চাষের খরচ বাড়ে। ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়ার কারণে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। ২০০৪ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছিল, সেই বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যশস্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে কার্যকারণগত ভাবে যুক্ত করে দেখেছেন অর্থনীতিবিদরা। দেখা গেছে, তেলের দামের ছোটখাটো ওঠানামায় খাদ্যশস্যের দামের তেমন কোন হেরফের না হলেও, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকলে খাদ্যশস্যের দামের ওপর তার সরাসরি প্রভাব পড়ে। অপরিশোধিত তেলের ভাণ্ডার যতই নিঃশেষিত হতে থাকে তেলের দাম যতই বাড়তে থাকে, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও যন্ত্রনির্ভর আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ততই ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। উৎপাদকদের কাছে কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন থেকে আয়ের পরিমাণ বজায় রাখার

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

জন্য কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ও খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি

অনেকেই মনে করেন বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, বিশেষ করে চীন ও ভারতে, সম্প্রতি মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ার ফলে সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাসে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ফলে এই সব দেশে খাদ্যশস্যের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। ২০০৮ সালে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ কঠিন খাদ্য পরিস্থিতি ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমনই একটি যুক্তি দিয়েছিলেন। আসলে মানুষের আয় বাড়লে দুভাবে খাদ্যশস্যের ব্যবহার বাড়ে। প্রথমত, মাথাপিছু গড় আয় বাড়ার সাথে সাথে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের গড় সরাসরি ভোগ বাড়ে। বিশেষত দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে থাকে। অন্যদিকে, উচ্চ আয়ের মানুষদের আয় বাড়লে তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন দেখা দেয়। খাদ্যতালিকায় সরাসরি খাদ্যশস্যের বদলে প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যশস্য ছাড়াও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির পরিমাণ বেড়ে যায়। কম দামের চালগমের জায়গায় বেশি দামি মাংস ডিম ইত্যাদি খাওয়া বাড়লে কিন্তু খাদ্যশস্যের অপ্রত্যক্ষ ব্যবহার অনেক বেশি বেড়ে যায়। এর কারণ মানুষের খাদ্য হিসেবে পশুর লালনপালন যত বাড়ে ততই পশুখাদ্য হিসেবে শস্যের প্রয়োজন বাড়ে। প্রতি কেজি মাংসের জন্য অনেকটা পরিমাণ পশু-খাদ্যশস্যের দরকার হয়। একটি হিসেবে দেখা যায়, আমেরিকাতে এক কেজি গরুর মাংসের জন্য শস্যের প্রয়োজন পড়ে ৭ কেজি, প্রতি কেজি শুয়োরের মাংসের জন্য ৬.৫ কেজি ও প্রতি কেজি মুরগীর মাংসের জন্য ২.৫ কেজি। তাই মানুষের খাদ্যতালিকায় মাংস ডিম ইত্যাদির আধিক্য হওয়ার অর্থ শস্যের ব্যবহার বহুগুণ বাড়া। একথা ঠিক যে গত কয়েক বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, বিশেষভাবে ভারত ও চীনে, মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু শস্যের ভোগ বেড়েছে এবং খাদ্য তালিকাতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বর্তমান খাদ্য সংকট বা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে একে যুক্ত করা যে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন তা আমেরিকার মত উন্নত দেশের সঙ্গে এইসব উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য তালিকার তুলনা করলেই বোঝা যায়। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) দেওয়া একটি হিসেবে দেখা যায় ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭, এই তিন বছরে ভারতে খাদ্যশস্যের অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ ব্যবহার ছিল মাথাপিছু ১৭৫ কেজি, চীনে এই পরিমাণ ছিল মাথাপিছু ২৮০ কেজি, যেখানে সারা পৃথিবীর মাথাপিছু গড় ব্যবহার ছিল ৩১৬ কেজি, এবং আমেরিকাতে ৯৫৩ কেজি। খাদ্য তালিকায় মাংসের ব্যবহারের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যেখানে ভারতে মাথাপিছু মাংসের গড় ব্যবহার বাৎসরিক ৫.০ কেজি, চীনে তা ৫৬.৮ কেজি, আমেরিকায় ১২৬.৬ কেজি। অর্থাৎ, আমেরিকায় মাথাপিছু গড় খাদ্যশস্যের ব্যবহারের পরিমাণ বিশ্ব-গড় পরিমাণের ৩ গুণ, চীনের ৩.৩ গুণ ও ভারতের ৫.৪ গুণ। ভারতের খাদ্যাভ্যাস কোনভাবেই বিশ্ববাজারে খাদ্যের যোগান কমানোর জন্য দায়ী নয়। বরং একথা বলা হয়ত ভুল হবে না যে সারা পৃথিবী যদি ভারতের খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করত তাহলে বিশ্বে খাদ্যশস্য যোগানে কোন ঘাটতি থাকত না, বরং উদ্বৃত্ত দেখা দিত ও শস্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকত।

খাদ্যশস্যের উৎপাদনে দীর্ঘকালীন হ্রাসের প্রবণতার কারণ

আমরা দেখেছি, সারা বিশ্ব জুড়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাসের দীর্ঘকালীন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় লভ্যতা ক্রমশ কমছে। পশু-খাদ্য হিসাবে বা জৈব-জ্বালানি হিসেবে শস্যের ব্যবহার খাদ্যশস্যের যোগান কমিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বের পশ্চাৎপদ দেশগুলির খাদ্যশস্য-নির্ভর গরিব মানুষদের কাছে খাদ্যশস্যের লভ্যতা আরও অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে। খাদ্যশস্যের এইসব ব্যবহার, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলির খাদ্যাভ্যাসের কারণে খাদ্যশস্যের বিপুল পরিমাণ পরোক্ষ ব্যবহারের কথা মাথায় রাখলে খাদ্যাভাব ও খাদ্য নিরাপত্তাহীন-তার বাস্তব সম্ভাবনা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। এই অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এর যোগান বৃদ্ধির যথেষ্ট উচ্চ হার বজায় রাখা। বিগত শতাব্দীর ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বণ্টন মানুষের ক্ষুধা মেটানোর মত মূল প্রয়োজন থেকে বিশ্বের অতিবৃহৎ বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক লাভ-লোকসানের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বের কৃষিপণ্যের বাজারে গত শতকের ৭০-এর দশক অবধি ছিল আমেরিকা ও কানাডার যুগ্ম আধিপত্য। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি কৃষিপণ্যের বাজারে নিট রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে একদিকে কানাডা সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির মধ্যে খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্যিক বৈরিতা চরম রূপ নেয়। দুই পক্ষই বিশ্ববাজারের বৃহত্তর অংশ অধিকার করার জন্য নিজ নিজ দেশের উৎপাদক ও বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে বিপুল পরিমাণ ভরতুকি ও নানা রকমের অর্থনৈতিক সহযোগিতা মারফত শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে থাকে। ফলে ৮০-র দশকে আমেরিকা-ভিত্তিক বাণিজ্যসংস্থাগুলি এবং ইউরোপ, বিশেষ করে ফ্রান্সের, বহুজাতিক কৃষি বাণিজ্যসংস্থাগুলির মধ্যে বাণিজ্য-যুদ্ধ চরমে ওঠে এবং এই দুই দিকের দেশগুলির ভরতুকি খাতে ব্যয় বিপুল আকার নেয়। দেখা যায় আমেরিকা ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলি তাদের মোট

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

উৎপাদিত খাদ্যশস্যের এক তৃতীয়াংশ রপ্তানি-বাজারের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। খাদ্যশস্যের সমগ্র আন্তর্জাতিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত মাত্র চার-পাঁচটি অতিবৃহৎ বাণিজ্যসংস্থার হাতে। যেমন ১৯৯০ সালে খাদ্যশস্যের বিশ্ববাজারে শতকরা ২৫ ভাগ অধিকার করত আমেরিকার কার্গিল কোম্পানি ও শতকরা ২০ ভাগ ছিল ইউরোপের কন্টিনেন্টাল গ্রেনের আয়ত্তে। এই বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলির কৃষিপণ্যের বিশ্ববাজার দখলের লড়াই আসলে এক দিকে আমেরিকা ও অন্যদিকে ফ্রান্সের নেতৃত্বে দুটি বাণিজ্য ব্লকের লড়াইয়ে পরিণত হয়। এদের মধ্যে বাজার দখলের জন্য কৃষক ও বাণিজ্যসংস্থা-গুলিকে ভরতুকি প্রদানের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী দেশগুলির এই প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক কৃষিপণ্যের বাজারের প্রসারের গতি তাল মেলাতে পারে না। ইতিমধ্যেই মধ্য ৬০ ও ৭০-এর দশকের সবুজ বিপ্লবের নয়াপ্রযুক্তির আশু ফলস্বরূপ পিছিয়ে পড়া উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেকগুলিই দীর্ঘকালীন অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়েও তাৎক্ষণিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়। ফলে খাদ্যশস্যের আমদানির চাহিদা কমে আসে। খাদ্যশস্যের লাভজনক বাণিজ্য যখন এই অবস্থায় পড়ে তখনই আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৃহৎ কৃষিসংস্থাগুলি তাদের বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য, বিশেষ করে রপ্তানির হার বজায় রাখার জন্য, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নতুন আন্তর্জাতিক কৃষিনীতির আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করে। বিশ্বের বাজারে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৃহৎ বাণিজ্যসংস্থাগুলির পক্ষে তাদের লাভের হার বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। নিম্নমুখী দামের কারণে বিপুল ভরতুকি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাজাকে প্রতিযোগিতা কঠিনতর হয়ে ওঠে। ফলে তাদের একমাত্র স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায় সারা বিশ্বে কৃষিপণ্যের, বিশেষ করে চাল ও গমের মত খাদ্যশস্যের, উৎপাদন কম রেখে দাম হ্রাস রোধ করা। পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় বৃহৎ একচেটিয়া সংস্থাগুলি সর্বদাই লাভের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য উৎপাদন কমিয়ে দাম বাড়াতে চায়। কিন্তু বিশ্ব খাদ্যশস্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে গেলে উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষি ব্যবস্থার ওপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। শুধু মাত্র কৃষি বাণিজ্য নীতিতেই নয়, উৎপাদনের নানা দিকের উপর আরও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ১৯৮৫ সালের শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ চুক্তির উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনায় যে নতুন প্রস্তাবগুচ্ছ গৃহীত হয় কৃষিবিষয়ক প্রস্তাব তার মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রস্তাব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কৃষি বিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে মেধাস্বত্ব বিষয়ক প্রস্তাবটি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিয়োগ নীতি যুক্ত হয়। এই সমস্ত নতুন নীতিগুলি প্রযুক্ত হতে থাকলে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের কৃষি অর্থনীতিতে বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়। সনাতন খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ অনেকগুণ বেড়ে যায়। ফলে সনাতন খাদ্যশস্যের চাষ গভীর সংকটে পড়ে।

১৯৯৫ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠিত হওয়ার পর উরুগুয়ে রাউন্ডের নানা প্রস্তাব ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর ১৪৮টি স্বাক্ষরকারী দেশের ওপর কার্যকর হতে থাকে। এর সঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রবর্তিত নয়া আর্থিক নীতি যুক্ত হয়ে এই সব দেশের অর্থনীতির নানা দিকে পরিবর্তনের সূচনা হয়। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির গোটা কৃষি ব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটে। উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষি অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতির এই পরিবর্তনগুলি পরবর্তীকালের বিশ্বজোড়া খাদ্যশস্য উৎপাদনের শ্লথ গতির জন্য কিভাবে দায়ী আমরা এখানে তারই আলোচনা করব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা গঠিত হওয়ার সময় থেকে আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান প্রমুখ উন্নত দেশগুলি এই সংস্থাটিকে নিজ নিজ দেশের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সামনে রেখে বিশ্বের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য আলাপ আলোচনা ও দরকষাকষির একটি ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। সে সমস্ত আলাপ-আলোচনা, দরকষা-কষির বেশির ভাগেরই উদ্দেশ্য উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত দেশের স্বার্থের অনুসারী করে তোলা। উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও তাদের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় এই সমস্ত আলাপ আলোচনায় যুক্ত হতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উন্নত দেশগুলির বহুজাতিক বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষার্থে উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থহানি হতে থাকে। যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা প্রবর্তিত কৃষি সংক্রান্ত নীতি 'বাজারের অধিগম্যতা' (Market Access) ও অভ্যন্তরীণ সহায়তার এই দুটি নীতি নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে আলাপ-আলোচনা, দরকষাকষির পরও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের কৃষিপণ্যের বাজারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থাগুলির জন্য প্রবেশাধিকারের বাধাগুলি অনেকটাই অপসারণ করতে ও একটি ন্যূনতম পরিমাণ কৃষিপণ্যের আমদানি মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে, উন্নত দেশগুলি কিন্তু তাদের উৎপাদক ও বাণিজ্য সংস্থাগুলির জন্য আর্থিক পরিমাণ কমানোর নীতিটি মোটেই যথাযথ কার্যকর করছে না। এর অর্থ, নতুন নীতির বলে এই সব অতিবৃহৎ সংস্থাগুলি আর্থিক সহায়তা নিয়ে সস্তায় চাল, গম, ভোজ্য তেল ইত্যাদি নিয়ে এদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের বাজারে বিপুলভাবে অনুপ্রবেশ করার অধিকার পায়। এর ফলে যে অসম প্রতিযোগিতার অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ফলে দেশের চাল, গম, তৈল-বীজ, চিনি ইত্যাদি উৎপাদকরা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও নিজেদের পণ্য লাভজনকভাবে বিক্রি করতে ব্যর্থ হয়। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে, যার জন্য ২০০২-২০০৩ সালে আমরা দেখেছি অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ইত্যাদি রাজ্যে বিপুল সংখ্যক চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে জিন-পরিবর্তিত নানা ধরনের বীজের উদ্ভব ঘটেছে। বিশাল বহুজাতিক সংস্থাগুলি নানাভাবে সংগৃহীত জিনের মধ্যে রদবদল ঘটিয়ে নতুন জিন সৃষ্টি করে মেধাস্বত্ব (পেন্টেন্ট) নিচ্ছে ও নতুন খোলামেলা বাণিজ্যনীতির সুযোগে উন্নয়নশীল দেশগুলির বীজের বাজারে বিপুলভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলত বীজের বাজার ক্রমাগত এদের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে আমাদের দেশের সরকারি বীজ সংস্থা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে বীজের উৎপাদন করে, তা বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার নীতি নিয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলি এরপর এই প্রাথমিক স্তরের বীজ নিয়ে পরবর্তী স্তরে এদের বিস্তার ঘটায় ও বাজারজাত করে। এইভাবে বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলি ক্রমশ বীজের বাজারে আধিপত্যের জায়গায় চলে আসে। ক্রমশ ইআইডি প্যারি, হিন্দুস্থান লিভার, আইটিসি-জেকে, র‍্যাবিশ, স্যান্ডোজ, পাইওনিয়ার, পিজিএস, কার্গিল ইত্যাদি বহুজাতিক বীজ কোম্পানিগুলির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ১৯৮৭ সালেই সংকর বীজ ও জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানিগুলিকে এদেশে বিনিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে, বিশেষ করে ১৯৯১ সালের পর, নতুন বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ নীতিকে হাতিয়ার করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বীজের উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আধিপত্য বাড়াতে থাকে। পাশাপাশি সার উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে ও একই ধরনের বাণিজ্য ও বিদেশি বিনিয়োগ নীতি অনুসরণের ফলে এই সব ক্ষেত্রেও বৃহৎ বিদেশি পুঁজির আধিপত্য ও অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এসবের ফলশ্রুতিতে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষি উপকরণের উৎপাদন ও বাজার অনেকটাই বিদেশি পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সার বীজ ইত্যাদি কৃষি উপকরণের প্রযুক্তিতে গবেষণা ও উন্নয়ন ক্রমশ বহুজাতিক সংস্থার কুক্ষিগত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব আইন এই সংস্থাগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার দেয়। অন্যান্য মেধাস্বত্বহীন সংস্থার অংশগ্রহণের অধিকার ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে নতুন প্রযুক্তির বীজ সার ইত্যাদি কৃষি উপকরণগুলি একদিকে এদেশের বাজার অধিকার করে নেয়, অন্যদিকে এই সব উপকরণগুলির দাম বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এসবের ফলে কৃষি উৎপাদকরা বীজ সারের জন্য এই সব সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে ও চাষের ব্যয় বেড়ে যায়।

অপরদিকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারের ধাক্কায় বহু উন্নয়নশীল দেশের কৃষিতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ ক্রমশ কমতে থাকে। কৃষি বাণিজ্যে, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদিতে ভরতুকি ও কৃষিতে মূলধনী ব্যয়ে সরকারের ভূমিকা ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে কৃষি উন্নয়ন, সেচ ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের ক্রমশ সংকোচন ও এ সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর ফলে চাল গম ইত্যাদি চিরাচরিত খাদ্যশস্যগুলির উৎপাদন ব্যয় বহু গুণ বেড়ে যায়। সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তির কার্যকারিতা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকায় এবং দীর্ঘদিন এই প্রযুক্তি অনুসরণের ফলে অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি ও চাল-গমের ক্ষেত্রে একর পিছু উৎপাদন বিপুল পরিমাণে কমে যায়। একই সঙ্গে এই প্রযুক্তিতে জলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ায় চাষের জন্য জলাভাব দেখা দিতে থাকে। সব মিলিয়ে চাল-গমের মত জল-নির্ভর শস্যের চাষ অলাভজনক হয়ে পড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দেশের বাজারের যোগাযোগ স্থাপনের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠানামা এইসব শস্যের অন্তর্দেশীয় বাজারে দামের ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে। ধান-গম উৎপাদনকারী চাষির কাছে কৃষিকাজে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি ক্রমশ বাড়তে থাকে; কৃষিকাজ অলাভজনক হয়ে উঠতে থাকে।

এইভাবে একদিকে সনাতন কৃষি ব্যবস্থার ক্রমাবনতি, অন্যদিকে বহুজাতিক বৃহৎ পুঁজির নতুন ধরনের সার বীজ নিয়ে অনুপ্রবেশ, এসবেই ফলে উন্নয়নশীল দেশের সমগ্র কৃষি ব্যবস্থা পরিবর্তনের মুখে পড়ে। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা এইসব দেশগুলির জন্য নূতন 'পরামর্শ' নিয়ে হাজির হয়। যার মূল কথা হল শস্য বৈচিত্র্য। বলা হল এইসব দেশ তার কৃষিব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার জন্য সনাতন খাদ্যশস্য চাষের বদলে নতুন ধরনের উন্নত প্রযুক্তির শাকসবজি ইত্যাদি হাল্কা ও উচ্চমূল্যের খাদ্য প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করুক। কারণ কৃষির বাজার এখন বিশ্বায়িত। এই বিশ্বায়িত বাজারে উন্নয়নশীল দেশগুলি শাক-সবজি, ফল, মাংস, ডিম ইত্যাদি উৎপাদনে বিশেষীকরণ করুক ও আন্তর্জাতিক বাজারে যোগানকারী হিসেবে দেখা দিক, আর চাল-গম ইত্যাদি জলসেবিত শস্যগুলি তারা সংগ্রহ করুক উন্নত দেশগুলির বহুজাতিকদের কাছ থেকে আমদানি মারফত। কৃষিক্ষেত্রে নতুন এই আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের 'উপদেশ' বিপুলভাবে প্রচলিত হতে থাকে ও শস্য বৈচিত্র্যকরণ কৃষি উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এসবের ফলে খাদ্যশস্যের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে চাল-সহ বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় লভ্যতা কমতে থাকে অথবা অতি নিম্ন একটি পরিমাণ বজায় রাখে। আমাদের দেশে ১৯৯০-২০০০-এর মধ্যে চাল ও মোট খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় লভ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। উন্নয়নশীল দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় দানা-শস্য জাত খাদ্যের ক্রমশ

এর পর ৩২ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

খাদ্য নিরাপত্তা ও দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার

রতন খাসনবিশ

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় জাতীয় কংগ্রেস যে নির্বাচনী ইস্‌তেহার প্রকাশ করে, তাতে বলা হ'য়েছিলো ‘‘জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মতো করে (along the line) আমরা একটি জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন চালু করব’’। কথাটিকে ব্যাখ্যা করে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলা হয়, ‘‘ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে (ক্ষমতায় এলে তারা) খাদ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করবে, যাতে করে সব মানুষের, বিশেষ করে সমাজের দুর্বল অংশগুলির, পর্যাপ্ত খাদ্যে অধিকার নিশ্চিত থাকে।’’ আরও বলা হয়েছিল, দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থিত গ্রাম বা শহরে বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার মাসে ২৫ কেজি চাল বা গম কিনতে পারবে মাত্র ৩ টাকা দরে— আইনে এরকম ব্যবস্থা থাকবে। যাঁরা বাড়িতে থাকেন না কিংবা যারা শহরে কাজ খুঁজতে এসেছেন, তাঁদের জন্যও সরকারি ভর্তুকিতে খাদ্যের ব্যবস্থা থাকবে প্রতিটি শহরে। ভর্তুকি যা লাগবে, তা যোগাবে কেন্দ্রীয় সরকার।

নির্বাচনে জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস আবার দিল্লীতে ক্ষমতায় ফিরে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার গড়েছে। সংবিধান প্রদত্ত পাঁচ বছরের শাসনকালের দুবছর অতিক্রান্ত হয়েছে এই সরকারের। খাদ্যের অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনটি কিন্তু এখনও লোকসভায় পেশ করা হয়নি। এ নিয়ে সমালোচনা তীব্র হয়ে ওঠার কারণেই সম্ভবত সরকার ইদানীং তৎপরতা বাড়িয়েছেন। খাদ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি বিলের খসড়া সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। আশা করা যায় লোকসভার আগামী অধিবেশনে এই বিলটি সাংসদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। যাই হোক প্রধানমন্ত্রী-অনুমোদিত যে খসড়া বিলটি বিভিন্ন মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই জানা গেছে কংগ্রেস-ইসতেহারে প্রতিশ্রুত খাদ্য নিরাপত্তা আইনের সঙ্গে তার আছে বিপুল তফাৎ। বলা হয়েছিল, খাদ্য-নিরাপত্তা আইন হবে অনেকটা গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনের মতো। গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন অনুসারে বছরে ১০০ দিন কাজের অধিকার হলো নাগরিকের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। গ্রামাঞ্চলে যে কেউ সরকারের কাছে বছরে ১০০ দিন অদক্ষ শ্রমিকের কাজ চাইতে পারে নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে। সরকার তাকে কাজ দিতে আইন অনুসারে বাধ্য। না দিতে পারলে কর্মপ্রার্থীকে টাকা দিতে হবে নির্দিষ্ট অঙ্কের। গ্রামীণ কর্মস্থান আইনের মতো করে যদি খাদ্য নিরাপত্তা আইন আনতে হয়, তবে তার মর্মার্থ হবে, এই খাদ্য নিরাপত্তার অধিকার হবে সর্বজনীন। ব্যবহারিক দিক থেকে এমন হতেই পারে যে সবাই এই অধিকার প্রয়োগ করবে না (যেমন কর্মনিরাপত্তার অধিকার প্রয়োগ করতে গ্রামের সব কর্মক্ষম মানুষ বিডিও অফিসে বা পঞ্চায়েত অফিসে কাজের জন্য ভিড় করে না)। কিন্তু আইনে এই অধিকার হওয়া উচিত সর্বজনীন। ক্ষমতায় আসার পর দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার দিল্লীতে সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বে যে জাতীয় পরামর্শ-সংস্থা গঠন করে, সেটি প্রথম দিকে এভাবেই আইনটি গড়ার কাজে হাত লাগায়। দু বছর পরে এসে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে খসড়া আইন মন্ত্রকগুলিতে পাঠানো হয়েছে, তাতে প্রতিশ্রুত খাদ্য নিরাপত্তার সেই মর্মার্থটাই নেই। এই আইন চালু হলে যা দাঁড়াবে তা হলো অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনারই একটি পরিবর্তিত সংস্করণ। ‘‘খাদ্যের অধিকার’’ নয়, সরকার দয়া করে খাদ্য জোটাবে অভুক্ত মানুষদের এই আইন অনুসারে। ঠিক যে জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিলো জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পকে পুরোনো ‘রোজগার যোজনা’র ধাঁচে ফেলে দেবার চক্রান্ত করে (যেটাকে প্রতিহত ক'রেছিলো এমন ইউপিএ-এর শরিক বামপন্থীরা, যাঁরা আইনটিকে ‘অধিকার’-এর চৌহদ্দির মধ্যেই রাখার দাবিতে অনড় থাকেন শেষ পর্যন্ত)। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকেও তেমনিভাবে ‘অধিকার’-এর জায়গা থেকে সরিয়ে সরকারি ‘ছাড়’-এর জায়গায় নেওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রক।

কেন এ কথা বলছি, সেটা ব্যাখ্যা করব। প্রতিশ্রুত আইনটি ছিলো খাদ্যের ‘অধিকার’ নিশ্চিত করার আইন। এ আইন চালু করার আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিলো খাদ্যপণ্যকে গণবণ্টন ব্যবস্থার অধীনস্থ করা। ভারতের সব নাগরিকই অত্যাবশ্যক খাদ্যপণ্যের যোগান পাবে গণবণ্টন ব্যবস্থা মারফত। কোন্ নাগরিক তার জন্য কতটা দাম দেবে সেটা নির্ভর করবে তার সক্ষমতার ওপর, যেটা মাপা যেতে পারে কয়েকটা স্পষ্ট এবং সহজ সূচকের মধ্য দিয়ে। জাতীয় পরামর্শসংস্থার প্রথম মিটিং-এই ভারত সরকারের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু করতে তাঁরা একেবারেই রাজি নন। চালগমের খোলাবাজার বলবৎ রাখতেই হবে, আন্তঃরাজ্য খাদ্যপণ্য চলাচলে কোনো নিয়ন্ত্রণ আনা যাবে না। (বামরা থাকতে খাদ্যপণ্যের আগাম বাজার নিষিদ্ধ ছিলো, সে নিষেধও তুলে নেওয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে এই দ্বিতীয় ইউপিএ-র শাসনকালে)

এবার তাহলে সমস্যাটা দাঁড়ালো, পঙ্গু গণবণ্টন ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়েই আনতে হবে খাদ্য-অধিকার-এর আইন। কাজটা কঠিন। কারণ এর মধ্যে আরও ঢুকবে ‘শিশু পুষ্টি’, ‘গণবণ্টনের সংস্কার’ এবং ‘অভিযোগের সুরাহা সংক্রান্ত আইনি বিধি’—যার

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

সবই দাঁড়িয়ে থাকবে ‘অধিকার’-এর ওপর। জাতীয় পরামর্শসংস্থার মিটিংগুলিতে এর ফলে যা হবার তা-ই হলো। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো, নাগরিকদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে— ‘অগ্রাধিকার পাওয়া গ্রুপ’, ‘সাধারণ’ এবং ‘বর্জিত’। অগ্রাধিকার পাবেন তাঁরাই যাঁরা ‘দারিদ্র্য রেখার নিচে’ অবস্থিত। এঁদের দেওয়া হবে অন্ত্যোদয়-এর দামে (চাল ৩ টাকা কেজি, গম ২ টাকা কেজি, বাজরা ১ টাকা কেজি) মাসে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য। ‘সাধারণ’ পরিবারগুলি পরিবার পিছু পাবেন মাসে ২০ কেজি খাদ্যশস্য— দাম দেবেন তাঁরা সরকারি ক্রয়মূল্যের অর্ধেক। বাকিরা ‘বর্জিত’ অর্থাৎ তাঁরা কোনো সুবিধেই পাবেন না এই ব্যবস্থায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এই পর্যন্ত যা ভাবা হ’য়েছিলো, সেটা ঠিক দিকেই যাচ্ছিলো। কিছু পরিবার নিশ্চয়ই বাদ যাবেন। যাঁদের সামর্থ্য আছে বাজার থেকে কিনে খাওয়ার তাঁরা কেন সরকারি সাহায্য পাবেন? সরকার তাঁদেরই সাহায্য করবেন, যাঁদের সামর্থ্য নেই। সামর্থ্যেরও নানা স্তর থাকে, স্তর অনুযায়ী সহায়তার রকমফের উচিত— সেটাই ন্যায়সঙ্গত। বিষয়টা কিন্তু অত সরল নয়। খাদ্য নিরাপত্তাকে যদি ‘অধিকার’-এর দিক থেকে দেখি, তাহ’লে কথা উঠবে— যাঁর সামর্থ্য আছে তাঁর অবশ্যই নিরাপত্তার দরকার নেই। কিন্তু কার সামর্থ্য আছে কার সামর্থ্য নেই— এটা কে ঠিক করবে? উত্তর যেটা সহজেই মনে আসে সেটা হ’ল, সরকার যেমন পরিবারগুলিতে ‘বিপিএল’, ‘এপিএল’-এ ভাগ করে, সামর্থ্যের মাপকাঠি হলো সেটাই। কথাটা ন্যায্য, কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, এর মধ্য দিয়ে ‘অধিকার’ ভঙ্গ হবার রাস্তাটা খোলা হয়ে গেল। সরকার কোনো এক মাপকাঠিতে নিজের ইচ্ছেমতো বানাবেন ‘অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত’, ‘সাধারণ’ ও ‘বর্জিত’দের তালিকা। আমি সে তালিকায় যেভাবে অন্তর্ভুক্ত হব, সেভাবেই থাকবে আমার খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ে অধিকার। আমি যদি সত্যিই অক্ষম হই এবং কোনো এক রাজনৈতিক বা আমলাতান্ত্রিক কারণে আমার নাম ‘অগ্রাধিকার’ থেকে ‘সাধারণ’-এ ফেলে দেওয়া হয়, তবে আমার বড়জোর যা করার আছে তা হলো ‘পিটিশন’ করা কিংবা কোনো এক দাদা বা টাউট ধরা। এসবের ফলে আমি যদি আমার নাম ঠিক জায়গায় আনতে পারি, তবে আমি পাবো সরকারি সহায়তা। না হলে নয়। অর্থাৎ আমার ‘অধিকার’ নয়, আমাকে দয়া ক’রে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে এবং সেই দয়াও পেতে হবে ধরাধরি ক’রে। গ্রামাঞ্চলে বিপিএল তালিকা নিয়ে যে সব কাণ্ড ঘটে, সেগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

সরকার যে এ পথই ধরতে চলেছেন, অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা যে পুরানো ‘খাদ্য সহায়তা’ প্রকল্পেই রেখে দেবেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে বিল শেষ পর্যন্ত তৈরি করা হচ্ছে তাতে সেই ইঙ্গিতই আছে। আগে যেমন ছিলো বিপিএল-এর চাল-গম, এখন সেটাই থাকবে। তবে প্রাপকদের তালিকা কিছুটা লম্বা করা হবে, ‘এপিএল’-এর একাংশ এই ‘খাদ্য সহায়তা’ প্রকল্পের সুবিধে পাবে। জাতীয় পরামর্শসংস্থা সুপারিশ ক’রেছিলো দশ শতাংশ পরিবারকে ‘বর্জিত’ তালিকায় রাখতে। প্রধানমন্ত্রীর খসড়ায় বাদ দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে ২৫ শতাংশকে। কেন ১০ শতাংশ নয়, ২৫ শতাংশ? পরিকল্পনা কমিশনের মন্টেক আলুওয়ালিয়া এর একটা জবাব দিয়েছেন, ৯০ শতাংশের জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হ’লে সরকারি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে হবে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ আর তার ফলে খোলাবাজারে খাদ্যশস্যের দাম বাড়বে— যেটা সরকার চান না। কেন খোলা বাজার রাখতেই হবে, কিংবা ‘বর্জিত’রা বেশি দামে চালগম কিনলে কী ক্ষতি— এ সব প্রশ্নের জবাব অবশ্য তাঁর কাছে নেই। এটারও কোন জবাব নেই যে খাদ্য নিরাপত্তার সুবিধে কে পাবে, কীভাবে তা ঠিক হবে। সরকারের সামনে আছে তেন্ডুলকর কমিটির সুপারিশ, জাতীয় পরামর্শ সংস্থার মতে যেটার ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে ৪৬ শতাংশ পরিবারকে ‘অগ্রাধিকার’ প্রাপকদের তালিকাভুক্ত করা যায়। সম্ভবত সেটা এবং তার সঙ্গে আরও ২৫ শতাংশের মতো পরিবারকে ‘সাধারণ’এর তালিকায় এনে চালু করা হবে এই খাদ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা। চালগম দেবার জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা থাকবে, না ক্যাশটাকা বা ‘ফুডস্ট্যাম্প’ দিয়ে এই ভর্তুকি ব্যবস্থা চালানো হবে, সেটা স্পষ্ট নয়। একটা ব্যাপার অবশ্যই স্পষ্ট। যেভাবেই এটা চালু করা হোক না কেন, এই ব্যবস্থাটি থাকবে ‘সহায়তা’র ছকে বাঁধা। ‘অধিকার’-এর ছকে বাঁধতে হলে বিষয়টাকে দেখতে হতো অন্য ভাবে, কিন্তু সেভাবে দেখতে সম্ভবত কোনো মতেই রাজি নন দ্বিতীয় ইউপিএ। যদি প্রথম ইউপিএ সরকারের ক্ষেত্রে যা হয়েছিলো এই সরকারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতো, অর্থাৎ সরকারকে এমন একটি দল বা ফ্রন্টের ওপর নির্ভর করতে হতো যারা মনে করে খাদ্যের অধিকার, কাজের অধিকারের মতোই, মানুষের মৌলিক অধিকার, তাহলে ঘটনা সম্ভবত অন্যদিকে গড়াতো। প্রথম ইউপিএ যেমন প্রচলিত ‘রোজগার যোজনার’ ধাঁচে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পকে দাঁড় করাতে পারেনি, খাদ্য নিরাপত্তা আইনকেও তেমনি বিপিএল র‍্যাশনের একটা রাজসংস্করণে দাঁড় করাতে পারতো না। সরকারের মর্জি নয়, খাদ্য নিরাপত্তার আইনটাতে থাকতো অধিকারের উপাদান।

কীভাবে সেটা রাখা যেতো? এটা যুক্তিসঙ্গত কথা যে সবাইকে কম দামে চাল-গম যোগানোর কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু এটা কেন বলা যাবে না যে সবাইকে খাদ্যশস্য কিনতে বা নিতে হবে গণবণ্টন ব্যবস্থা মারফত। নয়া উদারনীতি চালু হবার পর থেকে ভারত সরকার সুপরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে গণবণ্টন ব্যবস্থা তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছে। এটা করা হয়েছে প্রথমেই র‍্যাশনের চাল-গমের দাম খোলা বাজারের ওপরে তুলে দিয়ে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

যারা ভর্তুকির চাল-গম পায় না, এক ধাক্কায় সেই মানুষদের ঠেলে দেওয়া হলো র‍্যাশনব্যবস্থার বাইরে। শহর এলাকায় বিধিবদ্ধ গণবণ্টন ব্যবস্থার গঙ্গাযাত্রা ঘটলো এর ফলে। গ্রামের র‍্যাশন দোকানের গুরুত্ব কোনকালেই ছিলো না কারণ গ্রামাঞ্চল ছিলো আংশিক র‍্যাশন ব্যবস্থার অধীন। এই অঞ্চলে এবং শহরের র‍্যাশন দোকানেও তাই এরপর শুধু তারাই আসতে লাগলো, যারা ভর্তুকি পায়। এরা দুর্বল। র‍্যাশন ডিলাররা যাবতীয় জুলুম চাপালো এদের ওপর। সরকার দর্শক, কেন না র‍্যাশন ডিলারদের বক্তব্য, আগের মতো তাদের আর আয় নেই, সরকার চাইলে ডিলারশিপ খারিজ করতে পারে। সরকার জানে, কথাটা সত্যি। কাজেই ব্যবস্থাটার শ্মশানযাত্রা ত্বরান্বিত হলো। কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থাটার গোড়াটাই কেটে দিয়েছে সংগ্রহ মূল্যের ক্ষতি পোষাতে র‍্যাশনে চাল-গমের দাম খোলা বাজারের ওপর তুলে, অনেকেই এটা না বুঝে রাজ্যসরকারের নিন্দামন্দ শুরু করলো। কাজের কাজ কিছুই হলো না। যোগ করা উচিত, গণবণ্টন ব্যবস্থা যাতে আদৌ আর মাথা তুলতে না পারে, তার জন্য এফসিআইকেও পঙ্গু করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। এফসিআই-এর গুদামগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে অনেক জায়গায়, বড় শহরে এফসিআই-এর বহু জায়গা বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ এবং অন্ধ্রের কুলাকদের চাপে সংগ্রহ-মূল্যে ধান-গম এখনও কিনতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। সেগুলোর অনেকটা খোলা জায়গায় পচানো হয়। সরকারি নীতিপ্রণেতারা এসব নিয়ে কথা বলার বদলে 'ফুডস্ট্যাম্প' চালু ক'রে বাকি র‍্যাশন দোকানগুলোও তুলে দেবার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

যদি এই সরকার বাম-নির্ভর হতো তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা বিলের প্রথমেই থাকতো গণবণ্টন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার ব্যবস্থা। এটা করার সহজ উপায় ছিলো 'বর্জিত' বাদে বাকি সবাই যাতে বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে চাল গম পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কারা বর্জিত হবেন, সেটার জন্য রাখতে হবে একটা সহজ ও স্পষ্ট মাপকাঠি। ক্যালোরি-লভ্যতার জটিল অঙ্ক নয়, পরিকল্পনা কমিশনের 'দারিদ্র্য রেখা' নয়, এমন একটা মাপকাঠি যা থাকলে বঞ্চিতরা মামলা করতে পারে খাদ্যের অধিকার না পেলে। এই রকম মাপকাঠি নিয়ে ইদানীং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বহু আলোচনা হচ্ছে। সম্ভবত সবচেয়ে কার্যকর মাপকাঠিটি হবে রীতা খেড়া, সাবিনা আলকিরে এবং হিমাংশু বর্ণিত মাপকাঠিটি, জাতীয় পরামর্শদাতা কমিটির জাঁ দ্রেজ যে মাপকাঠিটি গ্রহণ করাতে চেয়েছিলেন ভারতসরকারকে। এই মাপকাঠিতে ধরা হয়েছে কয়েকটা সহজ এবং স্পষ্ট সূচক। যদি কেউ সরকারি চাকরি করে, একটা মোটরসাইকেল বা মোটরগাড়ীর মালিক হয়, যদি গৃহকর্তা দোতলা বা তার চেয়ে বড় পাকা বাড়িতে থাকে তবে তাকে ফেলতে হবে 'বর্জিত'দের তালিকায়। যে আজকে এই তালিকায় নেই, কিন্তু অবস্থা ভালো হওয়ায় আগামী বছর এই তালিকায় আসবে, সে বাদ যাবে আগামী বছর। আজকে যার এ সবের কোনো একটা আছে, কিন্তু অবস্থা বিপাকে পরের বছর তার অবস্থা খারাপ হয়েছে, সে আসবে খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় আগামী বছরে। তাকে এই নিরাপত্তা না দিলে সে প্রকল্প আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে বিনা খরচে, এই ব্যবস্থা থাকবে হবে খাদ্য নিরাপত্তা আইনে। যারা 'বর্জিত' নয়, তারা সবাই পাবে সরকারি সংগ্রহমূল্যের অর্ধেক দামে খাদ্যশস্য। আইনে এই ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটা তারা পাবে গণবণ্টন ব্যবস্থা মারফত। ফুড-স্ট্যাম্প মারফত নয়— সেটার স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে আইনে।

যারা দুর্বল, তাদের অবশ্যই আরও কম দামে চাল-গম দিতে হবে। সে রকম পরিবার কারা— সেটাও চিহ্নিত করা থাকবে আইনে। এর জন্য পরিকল্পনা দপ্তরের মারফত পরিবার সমীক্ষা করাতে হবে— যে কাজটা ২০০৯ সালেই একভাবে শুরু করা হয়েছিলো। এক্ষেত্রেও থাকবে কিছু স্পষ্ট সূচক, যেটা চিহ্নিত করা কঠিন নয়।

বলাবাহুল্য, এসবের কিছুই হবে না, কারণ যাদের নিয়ে চাপ সৃষ্টি করলে এরকম একটা অধিকারভিত্তিক আইন লাগু করা যেত, সেই বামপন্থীরা এখন দুর্বল। খাদ্য নিরাপত্তা বিল নিয়ে প্রকৃত বাম ঐক্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রচিত হবে না।

সম্মানের সঙ্গে উন্নয়ন

১২ পৃষ্ঠায় পর

সফল হবে একমাত্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে। স্থানীয় মানুষকেই নিজেদের সংগঠিত করে তুলতে হবে। তাদের হয়ে এ কাজ অন্য কেউ করে দিতে পারবে না।

জঙ্গলমহলের আন্দোলনের নেতাদের যখন প্রশ্ন করা হয়, গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করে কেন তাঁরা রাষ্ট্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা বলেন রাষ্ট্রের উন্নয়ন মানে বাঁধ, কারখানা আর খনি, মানে আমাদের বিস্থাপন, বিতাড়ন। সিকন্দর শীতে জুবুথুবু দার্শনিককে প্রশ্ন করেছিলেন, বাবা, আপনাকে কী দিতে পারি? উত্তর এসেছিল, কিছুই না বাছা, খালি আমার রোদ্দুর থেকে সরে দাঁড়ালেই হবে। রাষ্ট্রকে উন্নয়ন করতে হবে না, মানুষের উদ্যোগের রোদ্দুর থেকে সরে দাঁড়ালেই হবে। না হলে?

'বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে'।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

খাদ্য সংকট

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

পার্থ সারথি

কৃষি নিয়ে গল্প-কথা

বিগত বামফ্রন্ট জমানায় আমরা ২০০৬ সালে সিঙ্গুর-কাণ্ডের আগে অবধি এরাজ্যে কৃষির উন্নয়ন নিয়ে প্রচুর সরকারি প্রচার শুনেছি। শুনেছি কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য ও অগ্রগতির কথা। মজার বিষয় হল, সিঙ্গুরে কৃষি জমি নিয়ে আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার সাথে সাথে সরকারি প্রচারের অভিমুখ ঘুরে গেল কৃষিতে সাফল্য থেকে সংকটের গল্পে। নেতারা বলতে শুরু করলেন, এখন আর কৃষিতে লাভ নেই, জমি বিক্রি করে বরং সেই টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে চাষির লাভ বেশি। দেখা গেল, কৃষকের কিসে লাভ আর কিসে ক্ষতি সেটা কৃষকরা বোঝেননা, বোঝেন সেই সব নেতাগণ 'মাটিতে যাদের পড়েনা চরণ'। প্রশ্ন হল, এ রাজ্যে কৃষির অগ্রগতির ধারাটা যে সংকটের দিকে ঘুরে গেল, সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী ছিল?বামফ্রন্ট সরকার এই অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে কী পদক্ষেপ নিয়েছিল, সংকট মোকাবিলাতেই বা এই সরকারের ভূমিকা কী ছিল? তথ্য বলছে, অতীতের বামফ্রন্ট সরকার কৃষির সংকট দূর করতে প্রায় কিছুই করেনি, উল্টে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে সংকট আরো গভীরতর হয়েছে। তারপর কৃষককূল যখন সংকট মোকাবিলায় নিজেদের মতো করে উদ্যোগ নিচ্ছেন, তখন রাজ্য সরকার চাষ আর লাভজনক নয় এই দোহাই দিয়ে কৃষি জমি অধিগ্রহণে নেমে পড়েছে। বস্তুত, বিগত সরকারের কৃষক-বিরোধী নীতির ফলেই এরাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মূলত কৃষি নিয়ে গবেষণা-প্রসূত তথ্য ও সরকারি পরিসংখ্যান থেকে আমরা এরাজ্যে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার সাম্প্রতিক চেহারাটা বোঝার চেষ্টা করবো।

প্রথমে দেখব কৃষিতে সাফল্য এবং সংকটের পেছনে প্রকৃত গল্পটা কী? আমরা জানি, ১৯৮০-র দশকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনে একটা বড় ধরনের বিকাশ ঘটে। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত যেখানে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ২.৫ শতাংশ, ১৯৮০-র দশকে তা অনেকটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৮ শতাংশে।[১] গবেষকরা এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধান কারণগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করেনঃ "আমন ধানের ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং আমনের পাশাপাশি গরমকালে বোরো ধানের চাষ। এই দুই প্রকার চাষেই নিবিড়তা বৃদ্ধি পায় ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা দ্রুত বেড়ে ওঠায়, যার বেশির ভাগটা ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অগভীর নলকূপ।"[২] কৃষি-সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের মন্তব্য ছিল, "নিবিড় চাষের পদ্ধতির প্রয়োগ ত্বরান্বিত হয় নলকূপ ও পাম্পসেট ব্যবহারের ফলে।" লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সময়কালে, বস্তুত গোটা বামফ্রন্ট রাজত্বে, সরকারি সেচের ব্যবস্থা প্রায় কিছুই বাড়েনি। একজন গবেষকের তথ্য অনুযায়ী, বামফ্রন্ট আমলে সরকারি খাল থেকে সেচ ক্রমাগত কমেছে আর নলকূপ-সেচ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। নিচের টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৮০-৮৩ পর্যন্ত ২০ বছরে ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে সেচ-সেবিত জমির পরিমাণ ২২.৫ গুণ বেড়েছে।[৩]

	সেচ এলাকা (০০০ হেক্টর)	
বছর	*খাল-দ্বারা*	*ভূগর্ভস্থ জল*
১৯৬২-৬৩	৮৮৬	১৬
১৯৮২-৮৩	৭৫৬	৩৬০
২০০২-০৩	৫৬০	১৫০৮
পরিবর্তন (%)	-৩৬.৭৯	৯৩২৫

কিন্তু এই বিশাল বৃদ্ধিটাও মূলত হয়েছে ৭০ দশকের শুরু থেকে ৮০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়কালে কী হারে কৃষিতে পাম্প সেটের ব্যবহার বেড়েছে তার একটা অনুমান পাওয়া যাবে নিচের টেবিল থেকে[৪]:

		পাম্প সেটের সংখ্যা	
বছর	*বিদ্যুৎ-চালিত*	*ডিজেল-চালিত*	*মোট*
১৯৭২	২০৩৪	৫১৪৫	৭১৭৯
১৯৮৪	১২৯৩৮	১৯৫০৭০	২০৮০০৮
বার্ষিক বৃদ্ধি (%)	৪৪.৬৭	৩০৭.৬২	২৩৩.১২

অর্থাৎ সরকারি খালগুলো যখন ক্রমাগত অবহেলায় মজে গেছে এবং তারই ফলস্বরূপ কৃষির প্রাণ-শক্তি যোগায় যে সেচ-ব্যবস্থা তা মুখ থুবড়ে পড়ার মুখে, তখন প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে পকেটের পয়সা খরচ করে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা ব্যাপক হারে পাম্পসেটের সাহায্যে নলকূপ চাষ শুরু করে কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বামফ্রন্ট সরকার যে দাবি করত, কৃষিতে তারা অর্থাৎ সরকার বিরাট সাফল্য নিয়ে এসেছে, এটা যে কত বড় মিথ্যা তা উপরের তথ্য থেকে বেরিয়ে আসে। গ্রামের কোনো কৃষকের সাথে আলোচনা করলেও জানা যাবে বিগত সরকারটি কীভাবে কৃষককে শুধু বঞ্চিত করেই গেছে।

ঘটনা হলো, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লবের যে আন্দোলন ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গকে উত্তাল করেছিল, তার মোকাবিলা করতে এ রাজ্যে ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি কার্যকর করা শুরু হয়। সেই সময়ে সরকারি দফতর থেকে উচ্চফলনশীল বীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হত। সেই

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বীজের ব্যবহারের ফলে যেমন কৃষি উৎপাদন বেড়ে যায়, পাশাপাশি গরমকালে বোরো ধান চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৭-৭৮ সালে যেখানে বোরো চাষের এলাকা ছিল ৩০৮,৭০০ হেক্টর, মাত্র দশ বছরে ১৯৮৭-৮৮ সালে এই এলাকা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে হয় ৭৯২,০০০ হেক্টর। বস্তুত এই সময়েই সেচ-নিবিড় বোরো ধান চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল জলের যোগান দিতে হু হু করে গ্রামাঞ্চলে পাম্প সেট ছেয়ে যায়। সে সময় ডিজেলের দাম কম থাকায় এবং বিদ্যুৎ সংযোগের সুযোগ না থাকায় বেশির ভাগ কৃষকই ডিজেল পাম্প কিনে সেচের সুরাহা করেন। এই সেচ-ব্যবস্থার প্রসার মূলত ধানের উৎপাদনকে দ্রুত বাড়াতে সাহায্য করে। যদিও সবুজ বিপ্লবের প্রয়োগ বা সেচের সুযোগ বৃদ্ধি, এর কোনোটাতে বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না বললেই চলে (১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় রাজ্য সরকার গুচ্ছ প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু বৈদ্যুতিক পাম্প বসানোর ব্যবস্থা করে), তবু ধানের উৎপাদনে এই রাজ্য সারা দেশে প্রথম হওয়ায় বামফ্রন্ট সরকার তার কৃতিত্ব নিতে শুরু করে।

ভূমি-সংস্কারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি কতটা প্রভাবিত হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এরাজ্যে চাষ যেহেতু ক্ষুদ্র-জোত নির্ভর, সেখানে যিনি চাষ করছেন জমি যদি তার নিজস্ব হয়, তাহলে ভূমি-সংস্কার যেটুকু হয়েছে তার একটা ইতিবাচক প্রভাব কৃষি-উৎপাদনে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এখানে খেয়াল করা দরকার যে, বামফ্রন্ট সরকার বিরাট ভূমি-সংস্কার করেছে, এই গল্পটাতেও অনেক জল মেশানো আছে। প্রথমত, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই ভূমি-সংস্কারের প্রাথমিক পর্বটা সমাধা হয়েছিল। ২০০১ সালের মধ্যে বিলি হওয়া ১০.৪ লক্ষ একরের মধ্যে ১৯৭৭ সালের আগেই বিলি হয়েছিল ৬.২৬ লক্ষ একর জমি। বস্তুত, ১৯৬০-র দশকের শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গে উত্তাল কৃষক তথা গণ-আন্দোলনের যুগে (১৯৬৭-৭০ সাল) প্রায় ১০ লক্ষ একর জমি পূর্বতন জমিদার-জোতদারদের কব্জা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তার একটা বড়ো অংশ বণ্টিত হয়েছিল।[৫] দ্বিতীয়ত ১৯৯০-এর দশক থেকেই পাট্টা জমি বিক্রি ও বর্গা জমি বেহাত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূমি সংস্কারের বিপরীত যাত্রা শুরু হয়। সে তথ্য এর পরে।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিকভাবে আরও কিছু জমি বণ্টন করে এবং অপারেশন বর্গা মারফত ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ১২ লক্ষ বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করে। ১৯৬০-এর দশকে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত ভূমি সংস্কার এবং ১৯৭৭-পরবর্তী অধ্যায়ে আইনি ভূমি-সংস্কার কর্মসূচির সম্মিলিত প্রভাব ১৯৮০-র দশকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভূমি-সংস্কার কর্মসূচির সুফলগুলি হাতছাড়া হতে শুরু করে। দুটো তথ্য থেকে এই কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা অনুমান করা যেতে পারে। এক, ১৯৭৭ থেকে ২০০১-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৩.৬৩ লক্ষ। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায় যে, ১৯৯১ থেকে ২০০১ এই দশ বছরে এই রাজ্যের কৃষি-কর্মীদের মধ্যে মালিক কৃষকের অনুপাত ৫৩.৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৪৩.৪ শতাংশ, আর ভূমিহীন কৃষি-কর্মীর অনুপাত ৪৬.১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৬.৬ শতাংশ।[৬] দুই, যারা জমির পাট্টা পেয়েছেন তাদের ১৩.২৩ শতাংশ জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। পাশাপাশি, ১৪.৩৭ শতাংশ নথিভুক্ত বর্গাদার জমি থেকে উৎখাত হয়েছেন।[৭]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বামফ্রন্ট আমলের ভূমি-সংস্কার শেষ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনতার পরিমাণ বা প্রান্তিক কৃষকের সংকট বিশেষ কম করতে পারেনি। অন্যদিকে সবুজ বিপ্লব কর্মসূচির কুফলগুলি ফলতে শুরু করে মূলত সার-বীজ-কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধি এবং উচ্চফলনশীল বীজের উৎপাদন-শীলতা হ্রাস পাওয়ার মধ্য দিয়ে। এরই ফলে ১৯৯০-এর দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০০-০১-এর মধ্যে এই হার দাঁড়ায় ২.২৬ শতাংশ। এর পর থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির হারে স্থিতাবস্থা চলতে থাকে। আর খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিপুল হ্রাস লক্ষ্য করা যায় ২০০১-পরবর্তী সময়ে।

সংকট-বৃদ্ধিতে সরকারের ভূমিকা

এবার কৃষিতে যে সংকটের কথা বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরা এত বড়ো গলায় প্রচার করে বেড়ালেন, সে সংকট-বৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকা কিছু কম ছিল না। আমরা জানি, কৃষিতে সংকটের মূল কারণ হল কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি, ফলে উৎপাদন খরচ দ্রুত বেড়ে চলা, পাশাপাশি উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া। এই দু ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের কৃষক স্বার্থে যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল, তা নেওয়া হয়নি। আমরা আগেই দেখেছি, এরাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে নলকূপ মারফত সেচ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ-সংযোগের বন্দোবস্ত কম থাকায় শুরুতে কৃষকেরা ডিজেল-চালিত পাম্প ব্যবহার করে সেচের জল যোগান দিতেন। এবার ১৯৯১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ নীতির ফলস্বরূপ ডিজেলের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে (১৯৯০ সালে প্রতি লিটার ৩.৫৪ টাকা থেকে ১০ গুণ বেড়ে ২০০৭ সালে হয় ৩৪.৫০ টাকা)। ফলে ডিজেল-চালিত পাম্প দিয়ে সেচ ক্রমাগত খরচ সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ডিজেলের মূল্য-বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

সরকারের ওপর দায় চাপানো ছাড়া রাজ্য সরকার কোনো ভূমিকা নেয়না। সেচের পাম্পে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করে চাষের খরচ কমানোর বন্দোবস্ত করা যেত। কিন্তু রাজ্য সরকার সেচে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ তো নিলই না, উল্টে যে সমস্ত কৃষকেরা বৈদ্যুতিক পাম্প ব্যবহার করেন তাদের ওপর বিদ্যুতের চার্জ ক্রমাগত বাড়িয়ে চাষের খরচ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখলো।

সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সেচের কাজে যত সংখ্যক পাম্প চলত, তার মাত্র ১০ শতাংশে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল, যেখানে সেই সময় সারা ভারতে ৫১ শতাংশে সেচের পাম্প বিদ্যুতে চলত। সেচের পাম্প-এ বিদ্যুৎ পৌঁছানোর কাজে পশ্চিমবঙ্গ এমনকি বিহার (১১.৯ শতাংশ) ও উড়িষ্যার (২৭.৩ শতাংশ) থেকেও পিছিয়ে ছিল। কর্নাটক (৮৯ শতাংশ) বা মহারাষ্ট্রর (৮৮ শতাংশ) সাথে কোনো তুলনায় আসতে পারেনি এই রাজ্য।[৮] ভারতবর্ষের কিছু রাজ্য যেখানে কৃষকের উৎপাদন খরচ কম করার জন্য বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিয়ে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের ওপর ক্রমবর্ধমান হারে বিদ্যুতের চার্জ বাড়িয়ে চলে। একটা ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন শ্যালো পাম্প দিয়ে সেচ করার জন্য ১৯৮৫ সালে এই রাজ্যের একজন কৃষকের যেখানে বছরে ১১০০ টাকা বিদ্যুৎ-চার্জ দিতে হত, ২০০৭ সালে সেই চার্জ বেড়ে দাঁড়ায় ৮০০০ টাকা। একইভাবে, ওই একই শক্তির সাবমার্সিবল পাম্প চালিয়ে সেচের জন্য বিদ্যুতের খরচ ১৯৯৬ সালে ৩০৬০ টাকা থেকে ২০০৭ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১০,০০০ টাকায়। বর্তমানে বিদ্যুত-চালিত সেচ-পাম্পে মিটার বসানো হয়েছে, এবং তার ফলে অন্তত সাবমার্সিবল পাম্প চালানোর খরচ আরো বেড়ে গেছে বলে ক্ষেত্র-সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের অন্তত চারটি রাজ্য (পাঞ্জাব, কর্নাটক, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ) সেচ-পাম্পে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। এরাজ্যের তথাকথিত 'কৃষক-বন্ধু' বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারেও ভারতের অন্য রাজ্যের থেকে শুধু যে পিছিয়ে ছিল তা নয়, বরং কৃষকের ওপর বোঝা চাপানোর ব্যাপারে অন্যদের থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়েই ছিল। আর তারা এবিষয়ে কৃষকদের ক্ষোভ দমন করে রেখেছিল গ্রামাঞ্চলে পার্টিতান্ত্রিক অনুশাসন চালু করে।

এ রাজ্যে খাদ্য-নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই হিসাব করা দরকার আমাদের দরিদ্র সীমার নিচে কত সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন। কারণ এটা অনিবার্য যে, যারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন তাদের পক্ষে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার মত খাদ্য সংস্থান হয় না। তারা যদি পেট ভরে খাওয়ার মত খাদ্য-সামগ্রী কিনতে পারতেন, তাহলে রাজ্য খাদ্য-শস্যের চাহিদা অনেকটাই বেড়ে যেত এবং সেক্ষেত্রে আজকে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ও মজুত হলে আমাদের খাদ্য-নিরাপত্তা সুনিশ্চিত বলে ধরা হয়, সেই হিসাবটাই পাল্টে যেত। এখন দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত পরিবারগুলোকে হিসাবে আনার জন্য বিপিএল তালিকা তৈরির যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত যাদের বিপিএল বলে তালিকাভুক্ত করা হয়, তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক এবং বিরোধিতা আছে। বহু সংখ্যক প্রকৃত দরিদ্র পরিবার বিপিএল আওতার বাইরে থেকে গেছেন, এই অভিযোগ গ্রামাঞ্চলে ঘুরলেই শোনা যায়। তবু সরকারি হিসাবই যদি ঠিক ধরে নিই, তাহলেও আমাদের রাজ্যে ৩০/১০/২০০২ তারিখে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী ৩৬.৬৮ শতাংশ পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে ছিলেন।

রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের বেশি পরিবার যখন অর্ধাহারে দিন-যাপন করছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-শস্যের উৎপাদনের মোট ক্ষেত্র এবং পরিমাণের নিম্ন-গতি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ বলেই বিবেচিত হবে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০১-০২ সালে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের মোট ক্ষেত্র ছিল ৬৮,০৭,০০০ হেক্টর, যেখানে ২০০৫-০৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৬৪,৬৩,০০০ হেক্টরে। অর্থাৎ ৫ বছরে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জমি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর বা ৫ শতাংশ কমে গেছে। এই একই সময়ে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন কমেছে ১৬৫,০১,০০০ টন থেকে ১৫৬,৮৮,০০০ টনে। অর্থাৎ উৎপাদন কমার পরিমাণ ৮,১৪,০০০ টন, বা ৪.৯ শতাংশ।[৯] আরেকটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ধান এবং সব্জি উৎপাদন রাজ্যের বর্তমান চাহিদার তুলনায় বেশি হলেও (রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মানুষ অভুক্ত থাকার সুবাদে?) পশ্চিমবঙ্গে গম উৎপাদনে ৫০ শতাংশ এবং ডাল উৎপাদনে ৭৫ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া রাজ্যের তৈল-বীজের চাহিদার ৬০ শতাংশই অন্যান্য রাজ্য থেকে কিনতে হয়।[১০]

আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন ও নগরায়নের নামে ব্যাপকভাবে কৃষি-জমি ধ্বংস করার এক প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল, এবং বিগত এক দশকে ভট্টাচার্যের আমলে তার গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরই ফলে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র যেমন বিপুলভাবে কমে গেছে, তেমনি খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণও দ্রুত কমতে শুরু করেছে। দুটো বিষয়েই পাঁচ শতাংশ হ্রাস যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। এটা একটা সুনির্দিষ্ট ঝোঁক, যা রাজ্যের খাদ্য-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক। অন্যদিকে, এই কৃষি-জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আন্দোলন কেন্দ্র করেই বলা যায় সুদীর্ঘ বামফ্রন্ট সরকারের অবসান হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে আর কৃষি জমি অধিগ্রহন করা হবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নতুন সরকার

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তার জন্য শিল্পায়ন বা নগরায়ন থমকে থাকবে, এমন ভাবার কোন কারণ নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগে, প্রমোটার ও দালাল-চক্রের মাধ্যমে কৃষি-জমি হস্তান্তর ও কেনা বেচা চলতেই থাকবে। যদি না খাদ্য-নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে খাদ্য সমস্যার মোকাবিলার কথা বলছেন, যা প্রথম সবুজ বিপ্লবের মতোই শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং পরিবেশ বিপন্ন করবে বলে আশঙ্কা থেকে যায়। প্রকৃত ভূমি-সংস্কার সম্পন্ন করে কৃষিতে মেহনত করেন এমন প্রতিটি পরিবারের আপন খাদ্য সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অধিকার দেওয়া এবং সমস্ত কৃষি জমিতে সুলভে সেচের জলের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হলে খাদ্য-নিরাপত্তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছনো যাবে বলে মনে হয়। নতুন সরকার এব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে।

তথ্যসূত্র :

1. Rawal Vikash and Madhura Swaminathan : 'Agricultural Growth in West Bengal, 1950 to 1996', *EPW*, October 3, 1988
2. Rugali Ben, Barbara Harris-white and Sugata Bose (eds) *Sonar Bangla, 1999*, Sage Publication, New Delhi.
3. Narayanamoorty : *Trends in Irrigated Area in India: 1950-51 to 2002-03*
4. Siddheswar Roy in *Technological Development of Agriculture in West Bengal since Independence* (1992), Firma KLM Pvt Ltd, Kolkata.
5. D Bandyopadhyay : *Land Labour and Governence*, Worldview, Kolkata, 2007
6. *Statistical Handbook of West Bengal, 2004*, published by Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal.
7. *West Bengal Human Development Report, 2004*, Development and Planning Department, Government of West Bengal.
8. NSSO (1999), 54th round: *Cultivation Practices in India*, January 1998-June 1998, Department of Statistics and Programme Implementation, Government of India, August 1999, New Delhi.
9. *Statistical Handbook of West Bengal, 2004 and 2006*, published by Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal.
10. *The Telegraph*, 28.06.2006.

বিশ্বজোড়া খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা...

২৫ পৃষ্ঠায় পর

হ্রাস ও সে জায়গায় মাংস, ডিম, শাকসবজি ইত্যাদি বাড়লেও দেখা যায় অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এর কারণ, খাদ্য তালিকায় দানা-শস্য জাত সস্তা খাদ্যের বদলে বিকল্প বহুমূল্য শাকসবজি, ফল, মাংস, ডিম ইত্যাদি সামগ্রীর প্রাধান্য বাড়তে থাকলে দানা-শস্য কমার জন্য যে পরিমাণ পুষ্টির হ্রাস ঘটে সে ক্ষতিপূরণ কমতে হলে এক বিশাল পরিমাণ বিকল্প খাদ্য ভোগ করতে হবে এবং এই খাদ্য বেশি ব্যয়সাধ্য হওয়ায় সস্তার খাদ্যশস্যের ব্যবহার হ্রাস ঘটার কারণে যে বিপুল পুষ্টির ঘাটতি হয় তা অন্যান্য মূল্যবান খাদ্যসামগ্রী দিয়ে পূরণ করা উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অংশের মধ্যে অপুষ্টি, অনাহার ও অর্ধাহার বাড়তে থাকে। ভারতবর্ষে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার (NSSO)-র সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, যথাযথ পরিমাণে পুষ্টি পায় না এমন মানুষের অনুপাত ১৯৮৩ থেকে ২০০৪-০৫ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৩৮ ভাগ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬১ ভাগ। শহরাঞ্চলে তা ৬৬.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৯.৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখা গেছে, খাদ্য তালিকায় খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাসই অপুষ্টি বৃদ্ধির প্রধান কারণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি ও নয়া আর্থিক নীতি সারা পৃথিবীর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত দেশের অতিবৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থের অনুসারী করে পরিবর্তিত করার এক সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে হাজির হয়েছে। এর ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে ও বিশ্বে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু গড় লভ্যতা ক্রমশ কমছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নত দেশগুলির উচ্চ আয়ের মানুষের বিলাসবহুল খাদ্যাভ্যাস, যা পৃথিবীতে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের এক বিপুল অংশ ব্যবহার করছে। অন্যদিকে অপরিশোধিত তেলের ভাণ্ডার ক্রমশ সংকুচিত হওয়ার ফলে বিকল্প তেলের উৎস হিসেবে খাদ্যশস্য-উৎপাদক জমির ব্যবহার— এসবের ফলে খাদ্যশস্যের বিপুল অংশ মানুষের ক্ষুধা মেটানোর কাজে লাগতে পারছে না। একদিকে মুনাফার উচ্চ হার বজায় রাখার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদনে সংকোচন ঘটানো, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের বিকল্প ব্যবহারের কারণে বিপুল চাহিদা বৃদ্ধি; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাদ্যশস্যের ও কৃষি উপকরণের বিশ্বজোড়া বাজারে বহুজাতিক বৃহৎ সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নশীল দেশের চাষিদের এই বৃহৎ সংস্থাগুলির ওপর ক্রমবর্ধমান পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্ভরতা। এসবের ফলশ্রুতিতে চাল-গম ইত্যাদি সনাতন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমশ অনিশ্চয়তার সামনে পড়ছে ও সারা বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি গভীর সংকটের মুখোমুখি এসে পড়েছে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

খাদ্য সুরক্ষা

দেবিন্দর শর্মা

বিশ্বের সর্বাধিক বুভুক্ষা ও অপুষ্টি আক্রান্ত জনসমষ্টির দেশ ভারতবর্ষে ক্ষুধার্ত ও নিঃসম্বলদের খাদ্য যোগানের প্রক্রিয়া সদিচ্ছার দ্বারা চালিত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ হলো, প্রস্তাবিত খাদ্য সুরক্ষা আইন বুভুক্ষু মানুষদের আরো গভীরভাবে প্রকৃত নরকে নিক্ষেপ করবে।

সংবাদপত্রে যা পড়েছি এবং জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ প্রস্তাবিত সর্বশেষ খাদ্য সুরক্ষা বিলের খসড়া থেকে যা ধরা পড়ছে, তাতে ক্ষুধার্তদের জাহান্নমে যাওয়ার বর্তমান পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে বলে মনে হয় না। দারিদ্র্য-রেখার নীচের পরিবারগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করে কারা তিন টাকা কেজি দরে মাসে ২৫ কেজি (বা ৩৫ কেজি) খাদ্যশস্য (চাল অথবা গম) পেতে পারে, কেবলমাত্র সেটা চিহ্নিত করাই যদি নতুন আইনের প্রাথমিক লক্ষ্য হয়, তাহলে আমার মনে হয়, খাদ্যের অধিকারকে আইনের বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার আসল উদ্দেশ্য থেকেই ভ্রষ্ট হয়েছি। যাই হোক, এটা নিষ্ঠাবান পদ্ধতিতে দারিদ্র্য-রেখার ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা যাচাইয়ের সেই বহু বিতর্কিত ত্রুটিপূর্ণ পথেই অনুসরণ করছে।

প্রথমেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, বিশ্ব বুভুক্ষা সূচকে[১], ২০০৮ সালে ৮৮টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ৬৬তম। জঘন্য সরকারি বণ্টন ব্যবস্থার আগে 'উদ্দিষ্ট' (targeted) কথাটা জুড়ে দিয়ে যখন এটাকে একটু কাজের করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তখনই বুভুক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি পেল। ক্ষুধার মাত্রা এমন সময়ে বৃদ্ধি পেল যখন সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টা বিবেচিত হচ্ছে এবং সুপ্রিম কোর্ট একটি আবেদনের সূত্রে খাদ্য বণ্টনের উপর নজরদারি করার জন্য 'ফুড কমিশনার' নিয়োগ করেছে। বুভুক্ষা ও অপুষ্টি এমন সময়ে বৃদ্ধি পেল যখন অনেক বেশি অঙ্গনওয়ারি কর্মী কাজ করছে এবং অনেক বেশি বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন আহার সরবরাহ করা হচ্ছে।

সুতরাং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সাঙঘাতিক কিছু গোলমাল আছে। খাদ্য ও কৃষি, মানবসম্পদ এবং উন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন, শিশু ও নারী কল্যাণ— এই এতগুলি মন্ত্রকের সব মিলিয়ে ২২টি জাতীয় প্রকল্প বা কর্মসূচি আছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু বুভুক্ষার মাত্রা বেড়েই চলেছে।

সরকার যে খাদ্য সুরক্ষা বিল পেশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার প্রাথমিক লক্ষ্য প্রত্যেকটি গরীব পরিবারকে তিন টাকা কেজি দরে ন্যূনতম ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য সরবরাহ করা। এখন প্রশ্ন করার সময় এসেছে, প্রস্তাবিত বিলটি আদৌ কি গরিব ও বুভুক্ষুদের কাছে কোনো অর্থ বহন করে? যে গণবণ্টন ব্যবস্থা গত ৪০ বছরে উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, কী করে নিশ্চিত হবো যে সেই জঘন্য গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমেই বুভুক্ষার অবসান ঘটানো সম্ভব হবে? প্রস্তাবিত খাদ্য সুরক্ষা বিলটিকে 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ' বলা যায় না কি?

গণবণ্টনের রেশন ছাড়াও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আরও কিছু প্রয়োজন এবং সেখানেই আলোকপাত করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এমনকি খাদ্যের অধিকারের আন্দোলনও প্রাপ্তি যোগ্যতার (entitlements) বাইরে দৃষ্টিপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীর প্রস্তাবের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পার্থক্য নেই। প্রশ্নটা হচ্ছে, খাদ্যপ্রাপ্তি যদি ২৫ কিলো থেকে বাড়িয়ে ৩৫ কিলো করা হয়, তাতেই কি বুভুক্ষার নিরসন করা সম্ভব হবে? নিঃস্ব, অক্ষম ও নিরাশ্রয় মানুষকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলেই কি বুভুক্ষা অন্তর্হিত হবে?

উত্তর হলো : একেবারেই না।

যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলি বুভুক্ষাকে দুর্বহ করে তোলে, তার অধিকাংশই কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে সংপৃক্ত। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সেই বিষয়গুলি ছেঁটে দিতে পারছি, ভারতবর্ষে বুভুক্ষা হ্রাসে খুব একটা উল্লেখযোগ্য হেরফের ঘটানো সক্ষম হবো না। অতএব, সাধারণ যে আশঙ্কা/প্রশ্নগুলি ব্যক্ত হচ্ছে, সেগুলির প্রতি একটু চোখ ফেরানো এবং প্রস্তাবিত খাদ্য সুরক্ষা বিলটিকে কীভাবে অর্থবহ এবং কার্যকর করে তোলা যায়, তা দেখা যাক।

বুভুক্ষা মোকাবিলার অনেক কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের প্রয়োজনটা কী?

এটা সত্যি, বুভুক্ষার মোকাবিলা করার জন্য একগুচ্ছ চিত্তাকর্ষক কর্মসূচি আমাদের আছে এবং প্রতি বছর সেগুলির খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিও পায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু গরীবেরা ক্ষুধার্তই থেকে যায়। প্রতিটি বছর গত হওয়ার সাথে সাথে দরিদ্র ও নিঃসম্বলদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশের বেশি বুভুক্ষু মানুষের বাস ভারতে। বেশ কয়েকটি পর্যালোচনা বলছে যে, ভারতে প্রতিদিন ৫০০০ শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

সুতরাং, চালু প্রকল্পগুলির সঙ্গে আর একটা জুড়ে দিলেই, নিশ্চিতভাবে তা ক্ষুধার্তদের খুব একটা উপকারে আসবে না।

---

১ International Food Policy Research Institute (IFPRI) নির্ধারিত

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

জোড়াতালি-দেওয়া কার্যক্রমও বিশেষ সাহায্য করবে না। গণবণ্টন ব্যবস্থায় রেশন কার্ডের বদলে ফুড স্ট্যাম্পের প্রতিস্থাপন এরকমই এক অপকৃষ্ট উদ্যোগ। এ রকম ধার-করা ধ্যানধারণাতে যদি আমরা গোঁ ধরে থাকি, বুভুক্ষা বেড়েই চলবে।

আমি নিজে বুভুক্ষা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ঘোরতর সমর্থক। কিন্তু খাদ্যের অধিকারকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি-সহ আর একটি আইন হলেও) বুভুক্ষু ও অভাবী মানুষ এবং এই আতঙ্কজনক তালিকায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বছর বছর সংযুক্ত হচ্ছে, তাদের কিছু এসে যাবে না। সাধারণ কাজকর্ম এবং বৃদ্ধির জন্য মানব শরীরের যা খাদ্য চাহিদা, কাগজে-কলমে তার অর্ধেকের নিশ্চয়তা প্রদান করে (সেটাও গরিবদের হাতে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ) খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা যায় না।

বুভুক্ষা মূলত আমাদের ভুল নীতির এবং বণ্টন ব্যবস্থা যে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ, এটা স্বীকার করার ক্ষেত্রে আমাদের অক্ষমতার ফলশ্রুতি। বর্তমানে বুভুক্ষা মোকাবিলায় এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে কম করেও ২২টি সরকারি কর্মসূচি চালু আছে। বিভিন্ন মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত এই কর্মসূচিগুলির বিস্তার মধ্যাহ্নকালীন আহার থেকে শুরু করে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন, এবং অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা থেকে অন্নপূর্ণা যোজনা পর্যন্ত।

চালু কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে নি, এটা মাথায় রেখে, প্রস্তাবিত খাদ্য সুরক্ষা আইনটিকে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যবহার করার সমুচিত সময় উপস্থিত। এটা একটা মস্ত সুযোগ। বুভুক্ষা মোকাবিলায় দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন আনতে জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদের ব্যর্থতা আমাদের নিশ্চিতভাবে হতাশ করেছে। সমস্ত বিষয়টা, কিছু আমলার হাত থেকে স্বনিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে গেছে। বুভুক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিশেষজ্ঞদেরই একচেটে অধিকার। আঞ্চলিক স্তরে বিতর্কের মাধ্যমে বিষয়টাকে জাতির কাছে নিয়ে যেতে হবে।

চালু গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তোলার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিতে পারছি না কেন?

সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিচারপতি ওয়াধা কমিটি সঠিকভাবেই চলতি গণবণ্টন কর্মসূচিকে 'বোগাস' আখ্যা দিয়েছিল। স্পষ্ট দেখানো হয়েছিল, কয়েকটি রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, আর কয়েকটি রাজ্যে ধুঁকছে। দুর্নীতি, অপচয় এবং অকর্মণ্যতা সমস্ত ব্যবস্থাটিকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। প্রচুর খাদ্য খোলা বাজারে চলে আসে। গণবণ্টনের জন্য খাদ্যশস্য বাংলাদেশ, এমন কি নেপালেও পাচার হয়। বিচারপতি ওয়াধার মতে, রেশন দোকানে খাদ্যশস্য পৌঁছনোর আগেই ৮০ শতাংশ দুর্নীতি নিষ্পন্ন হয়। খাদ্যশস্য অপচয় ও পাচারের অনেক হিসাব-নিকাশ হয়েছে, কিন্তু বাস্তব হলো, গণবণ্টন ব্যবস্থা পরিষেবা দিতে ব্যর্থ।

সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত উপদেষ্টামণ্ডলী যেটাকে সুস্পষ্টভাবে পচা-গলা বলে অভিহিত করেছে, সেই গণবণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করাটা আসলে গরিব ও ক্ষুধার্তদের সঙ্গে মজা করার সামিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও সক্রিয় কর্মীরাও এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট কারণ তা প্রভূত রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ব্যবস্থা করে দেয়। মুখ্যত এই কারণেই সরকারের ভাবনার সঙ্গে, নাগরিক সমাজের একাংশের প্রস্তাবের বিশেষ ফারাক থাকছে না। জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ, ব্যবস্থাগত ছিদ্রগুলি মেরামত না করেই বিক্ষোভ প্রশমনের নতুন এক নকসা প্রস্তুত করছে।

কিন্তু একটা বণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। আমি চালু গণবণ্টন প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তনের দাবি করছি। ছোটখাট মেরামতে কিছু কাজ হবে না। এর বদলে আরও কঠোর ও কার্যকর পদ্ধতি দ্বারা পালটে দাও। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অনেক বেশি গণমুখী কর্মসূচি লাগু করা যায়, সেখানে বণ্টন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ ও প্রসারের একটা সীমারেখা থাকা প্রয়োজন। পরে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মন্ত্রীগোষ্ঠী প্রস্তাবিত প্রকৃত দরিদ্র-সংখ্যার সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ কি দরিদ্রতমদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে?

সবচেয়ে আগে বাস্তবসম্মতভাবে দারিদ্র্য-রেখা নির্ধারণ করার সময় এসেছে। তেন্ডুলকার কমিটির মতে ৩৭ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। এর আগে অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি বলেছিল, ৭৭ শতাংশ মানুষের (৮৩.৬ কোটি) দৈনিক ২০ টাকার বেশি খরচ করার ক্ষমতা নেই। এখন বিচারপতি ডি পি ওয়াধা কমিটি প্রস্তাব করেছে ১০০ টাকার কম উপার্জন হলে দারিদ্র-রেখার নীচে বলে গণ্য করতে হবে।

বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে আঁটোসাঁটো দারিদ্র্য-রেখার অন্যতম একটি ভারতে প্রচলিত। আমার মনে হয়, ত্রুটিপূর্ণ লক্ষমাত্রা ধার্যের মধ্য দিয়েই গোলমালটা শুরু হয়েছে। নরসীমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে যোজনা পর্ষদ দরিদ্রদের সংখ্যা ৩৭ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে নামিয়ে আনে। পরবর্তী যোজনা পর্ষদ দায়িত্ব গ্রহণের পর পুরোনো হিসেবই আবার চালু হয়। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ঐ ১৯ শতাংশ (১৯৯০-এর গোড়ায়) আমরা যদি ধরে থাকতাম, সরকারের খাতায় এতদিনে বুভুক্ষা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

ট্র্যাজেডি এটাই যে, এত অসংখ্য কমিটি আর অর্থনৈতিক সমীক্ষার কোনোটাই দারিদ্র-রেখার আরও অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নি, যাতে ক্রমবর্ধমান বুভুক্ষাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, যোজনা পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান মণ্টেক সিং আলুওয়ালিয়া এখন বলছেন, তেণ্ডুলকর কমিটি প্রদত্ত ৩৭ শতাংশ বিপিএল-এর সুপারিশ 'যুক্তিসম্মত'।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বুভুক্ষার গভীরতা কিন্তু নীতি-প্রস্তুতকারকেরা কী বলছেন, তার ওপর নির্ভর করে না। বাস্তবকে মেনে নিয়েই যা করণীয় সেটা করতে হবে।

ত্রুটিপূর্ণ হিসেবের ভিত্তিতে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা কোনো কাজে আসে না। সেজন্যই আমার পরামর্শ হলো, ভারতে দুটো দারিদ্র্য-রেখা থাকা উচিত; একটা চরম দরিদ্রের শতকরা অংশ, অপরটি অপুষ্টি-আক্রান্ত কিন্তু ততটা বুভুক্ষা পীড়িত নয়। সুরেশ তেন্ডুলকর কমিটির সুপারিশ মতো ৩৭ শতাংশ নতুন বুভুক্ষা দারিদ্র্য-রেখা হওয়া উচিত, যাদের জরুরি ভিত্তিতে কম দামে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি প্রযুক্ত ৭৭ শতাংশ সীমারেখা নতুন দারিদ্র্য-রেখা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

এই মান একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য মোকাবিলা করার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর হবে।

ভারতে প্রত্যেক দরিদ্রকে খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায়?

প্রায়ই একটা কথা বলা হয়ে থাকে প্রত্যেক ভারতীয়কে খাওয়াবার খরচ সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। এটা সত্যের অপলাপ। সর্বজনীন গণবণ্টন যদি চালু রাখা হয়, তাহলে হিসাবমতো ৬ কোটি টন (পরিবার পিছু ৩৫ কেজি ধরে) খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। অন্যভাবে, সমগ্র জাতিকে খাওয়াতে লাগবে বছরে ১.১০ লক্ষ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত খাদ্য সুরক্ষা বিল গণবণ্টন ব্যবস্থায় পরিবার পিছু খাদ্য গ্রহণের মাত্রা ৩৫ কেজি থেকে বাস্তবত ২৫ কেজি-তে নামিয়ে দিয়েছে। বিপিএল-ভুক্ত পরিবারগুলিকে কেজি পিছু ৩ টাকা দরে ২৫ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়ার অর্থ হলো, সরকার সুকৌশলে খাদ্য ভর্তুকি হ্রাস করলো।

শিল্প ও বাণিজ্যে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি ও কর মুকুবের উদ্দেশ্যে, সরকার যখন শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক উৎসাহ দিতে পারে এবং ২০১০-১১ সালের অর্থবর্ষে ৫ লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব ছাড় দিতে পারে, তখন কী করে সরকার বলে যে বুভুক্ষা মোকাবিলার জন্য তার অর্থ নেই? ২০১০-১১ সালে, খাদ্যব্যয় বাবদ ধার্য ৫৬ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা হিসাব মতো ২৫৪২৮ কোটিতে নেমে আসবে। কিন্তু জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদের সর্বশেষ অবস্থান অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে ৯০ শতাংশ ও শহরে ৫০ শতাংশ মানুষকে যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী খাদ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ ৭০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছোতে পারে। বুভুক্ষা ও অপুষ্টির প্রশ্নে যে দেশের অবস্থা আফ্রিকার সাহারা-নিম্ন অঞ্চলের থেকেও খারাপ, সেই দেশের সরকার বুভুক্ষা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে এত বাহানা করছে, এটা আশ্চর্যের নয় কি?

যে ভাবেই হোক, সরকার একটা ধারণা সৃষ্টি করেছে, ক্ষুধার্তদের খাদ্য পূরণের মতো অর্থ দেশের নেই। এর থেকে বড়ো অসত্য আর নেই। শিল্প ও বাণিজ্যে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি ও কর মুকুবের উদ্দেশ্যে, সরকার যদি, শিল্পকে ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক উদ্দীপনা দিতে পারে (বাস্তবে শিল্পের এত চাহিদাই নেই), এবং ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব ছাড় দিতে পারে, তারপরে কী করে সরকার বলে যে, তার টাকা নেই?

বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ ১১ লক্ষ কোটি টাকা। এর অর্থ, বাজেটে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা ছাড়াও সরকার শিল্পপতিদের বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রত্যক্ষ সুবিধা দিচ্ছে। আর বাজেট বহির্ভূত বলে, রাজস্ব ছাড়কে বলা যায় মূলত 'টেবিলের তলা দিয়ে দেওয়া'।

আমার পরামর্শ, রাজস্ব ছাড় থেকে অবিলম্বে ৩ লক্ষ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হোক। তা থেকে ক্ষুধার্তের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার, এবং উপরন্তু পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ-সহ নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের সংস্থান হবে। বরাদ্দ খাদ্যে, গম ও চালের সঙ্গে পুষ্টিকর দানাশস্য ও ডালও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সর্বকালীন খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে কি নীতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন?

কোন কিছুই করা সম্ভব হবে না, যদি না দীর্ঘস্থায়ী কৃষিকে গুরুত্ব দিতে, জমি অধিগ্রহণ বন্ধ করতে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বেসরকারিকরণ রুখতে নীতিগত স্তরে কতকগুলি পরিবর্তন সূচিত না হয়। এমন নীতির প্রয়োজন যা আগামী দিনে স্থায়ী খাদ্য নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এভাবেই সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের (inclusive growth) ভিত্তি রচিত হবে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে শ্রমশক্তি ব্যবহারে অক্ষমতার নিরিখে ক্ষুধার্ত জনতা বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতির সামিল। প্রস্তাবিত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিলকে কেন্দ্র করে বিতর্ক, ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্র নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার সুযোগ এনে দিয়েছে, যার ফলে বুভুক্ষা ইতিহাসে স্থান পেতে পারে।

বুভুক্ষাকে শূন্যে পরিণত করা নিশ্চিত করতে আমি ৬ দফা কর্মসূচীর প্রস্তাব রাখছি :

১) রেল লাইন, খাল খনন ইত্যাদি অত্যাবশকীয় কারণ ছাড়া কোনো কৃষি জমি অকৃষি উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করা যাবে না।

২) মাটির উর্বরতা এবং প্রাকৃতিক উৎসের পুনঃসংস্থাপনের মাধ্যমে কৃষির পুনর্জীবন।

৩) ফসলের ন্যূনতম দাম বেঁধে দিয়ে কৃষকদের স্থির মাসিক আয়ের ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র-ঋণ গ্রাহকদের দরিদ্রতম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, সুদের হার ১৮-৪৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে সর্বাধিক ৪ শতাংশ হারে নিশ্চিত করতে হবে।

৪) অন্ত্যোদয় পরিবারগুলি ব্যতীত সর্বত্র গণবণ্টন ব্যবস্থা বাতিল করো। বিহার ও পূর্ব ভারতে, খাদ্য সুরক্ষার জন্য

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

প্রচলিত শস্য-গোলার ধরনে গ্রাম স্তরে শস্য ব্যাঙ্ক প্রতিস্থাপিত করো।

৫) দেশের জনসাধারণকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য যোগানের পর খাদ্যশস্য রপ্তানির অনুমতি দিতে হবে।

৬) অবাধ বাণিজ্য চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে, দেশীয় কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না।

গ্রামে যারা খাদ্য তৈরি করছে, তাদেরকেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রিযাপন করতে হচ্ছে, এটা দুঃখের নয় কি?

ক্ষুধার সমাধানে ঠিক এই জায়গাটিতেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এর ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থার প্রতিও আমাদের নির্ভরতা কমবে, এবং ফলত তার সাথে খাদ্য-ভর্তুকির পরিমাণও কমবে। ভারতে ৬ লক্ষের বেশি গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করার নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারছি না কেন?

প্রস্তাবিত খাদ্য সুরক্ষা আইনে, গ্রামে ও তালুকে সমষ্টি-নিয়ন্ত্রিত ছোট ছোট শস্য-ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার বিষয়টি রাখা উচিত। ক্ষুধার মোকাবিলায়, দরিদ্র এবং বুভুক্ষুদের যতক্ষণ না সামিল করা হচ্ছে, কোনো দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য সুরক্ষা পরিকল্পনার স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। সাবেক শস্য-ব্যাঙ্কের সফল নমুনার প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন, বিহারের বহুশ্রুত শস্য-গোলা প্রথা। জাতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে, স্বনিযুক্ত গ্রুপ ও বেসরকারি সংগঠন-গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এইগুলিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

আমি জানি, আমাদের দেশে শতাধিক গ্রাম আছে, যেগুলি চার দশকে বুভুক্ষা আক্রান্ত হয় নি। তারা সাবেক 'মিলেমিশে থাকার ও যত্ন নেবার' বিষয়ে অভ্যস্ত। আমার মনে হয়, দেশের সমস্ত গ্রামে এই প্রথার বিস্তার লাভ করা উচিত। গ্রামের মানুষরাই খাদ্য সুরক্ষার দায়িত্ব নিক।

ব্রাজিলের মতো ভারতেরও শূন্য-বুভুক্ষা কর্মসূচি সূত্রায়িত করার সময় এসেছে। একটি অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। আমি বুঝি না, গ্রামে, যেখানে বছরের পর বছর দেশের জন্য যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন হয়ে আসছে, সেখানকার মানুষেরা কেন ক্ষুধার্ত থাকবে। সমষ্টি-ভিত্তিক শস্য-ব্যাঙ্ক গঠন করে গ্রামগুলিকে খিধে থেকে মুক্ত করতে হবে।

শহর এবং খাদ্য-ঘাটতি অঞ্চলে সার্বিক গণবণ্টন ব্যবস্থা প্রয়োজন। চালু গণবণ্টন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়া, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে খাদ্যশস্য বিতরণের কাজে সামিল করার প্রয়োজনটাও বেশ জরুরি। বাঙ্গালোরের মতো শহরে তারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এই শিক্ষাটা আত্মস্থ করতে হবে।

❑ *'Ground Reality'* (http://devinder-sharma.blogspot.com), 24 June, 2011 সংখ্যা থেকে গৃহীত

জিতেন মারান্ডিদের ফাঁসির আদেশ রদ করতে হবে

২ পৃষ্ঠায় পর

বিশাল ভাণ্ডার। এছাড়া রয়েছে যাদুগোড়াতে ইউরেনিয়াম খনি। এগুলো এক সময় সবই ছিল সরকারি সম্পত্তি। উদারনীতির খোলা দরজা দিয়ে অধুনা দলে দলে ঢুকে পড়েছে এসার, জিন্দাল, টাটা, আর্সেলর মিত্তাল এবং এরকম আরো অনেক অনেক দেশি-বিদেশি বড়ো বড়ো কোম্পানি। যা কিছু সম্পদ রয়েছে, মাটির ওপরে বা নীচে, সব তাদের চাই। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অরণ্য, আদিবাসীরা পরিণত হচ্ছে পরবাসীতে। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯— এই দুই বছরে ঝাড়খন্ডে ৪ লক্ষ হেক্টর বনভূমি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানিকে মাইনিং লীজের অনুমতি দেওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়েছিল ৯০৫৯ হেক্টর। (ছত্তিশগড়ে একই কারণে বন ধ্বংস হয়েছে ১৪৪২১ হেক্টর) ২০০৩-০৪ সালে ঝাড়খন্ডে ৪৫১৮৫ হেক্টর জমিতে মাইনিং লীজ দেওয়া হয়েছিল। এতে যে কর্মসংস্থান বেড়েছে, এমন ভাবনার কোন স্থান নেই। কারণ অন্যান্য সমস্ত শিল্পের মতো খনি শিল্পেও কর্মসংস্থান কমছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে প্রতি ১ কোটি টাকার খনিজ উৎপাদনে ভারতে ২৫ জনের কর্মসংস্থান হত, ২০০৩-০৪ সালে সেখানে প্রয়োজন হচ্ছে মাত্র ৮ জনের।

স্বাধীন ভারতবর্ষে উন্নয়নের রাস্তা প্রশস্ত করতে প্রথম ৪১ বছরে (১৯৫০-১৯৯১), অর্থাৎ নয়া উদারনীতি প্রবর্তিত হওয়ার আগে, ২.১৩ কোটি মানুষকে উৎখাত হতে হয়েছে। তার পরের ৯ বছরে, উন্নয়ন নয়া উদারনীতির খাতে তীব্রতর হওয়ার পর উৎখাত হয়েছে ৩ কোটি মানুষ। উচ্ছিন্ন মানুষের ৪১ শতাংশ আদিবাসী। ঝাড়খন্ডে জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ আদিবাসী। উন্নয়নের ঝড় এদেরই উপর আঘাত হেনেছে সব থেকে বেশি মাত্রায়। ঝাড়খন্ড রাজ্যের ১৩ শতাংশ আয় সংগৃহীত হয় খনিজ উত্তোলন থেকে। কিন্তু রাজ্যের ৪৪ শতাংশ অধিবাসীর বসবাস দারিদ্র্য সীমার নীচে। ৬ শতাংশের দুবেলা খাবার জোটে না। ক্ষুধা সূচকের (Hunger Index) ভিত্তিতে ঝাড়খন্ড দ্বিতীয় ক্ষুধার্ত রাজ্য।

এই শোষণ ও লুঠতরাজের বিরুদ্ধে আদিবাসী, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষদের সমবেত করার অপরাধে, তাদের অধিকার সচেতন করার অপরাধে, শাসক শ্রেণী ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের লুঠের বখরা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধাদানের 'অপরাধে' জিতেনদের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে। রাষ্ট্রশক্তির এই মদমত্ত প্রয়াস অবিলম্বে প্রতিহত করতে হবে। জিতেন মারান্ডি এবং অন্যান্যদের ফাঁসির আদেশ রদ করতেই হবে। মিথ্যা মামলায় জড়িত সমস্ত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে। ঔপনিবেশিক আইনের ১৬৪ ধারা বাতিল করতে হবে। এই দাবীতে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ সমবেত হোক।

তথ্যসূত্র : *Rich Lands Poor People*— CSE

প্রণব দে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পাঠকের কলমে

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন এবং জনমতের প্রতিফলন

অনীক-এর এপ্রিল ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত পার্থসারথির 'পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও গণতন্ত্র-ভাবনা' শীর্ষক নিবন্ধ সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলার জন্য এই পত্রের অবতারণা। পার্থসারথির মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নেই। আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রতিফলনের চেষ্টা হলেও তা যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত জনমতকে প্রতিফলিত করতে পারে না, এ নিয়ে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। তবে তাঁর অন্য দু'একটি বক্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

পার্থসারথি নির্বাচনে সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্টের অনৈতিক কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন। তার অভিযোগগুলো মূলত সত্য। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের ত্রয়োদশ (২০০২) বিধানসভা নির্বাচনের পর এই *অনীক* পত্রিকাতেই একটি নিবন্ধে সেবার পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, কেশপুর এবং হুগলীর আরামবাগ, খানাকুল বা গোঘাটে নির্ব্বাচনের নামে যে প্রহসন হয়েছিল তার বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম ('বুদ্ধের বোধিলাভ ও মমতার বিষোদগার'— সুদীপ্ত সেন, *অনীক*, জুন ২০০২) এই নিবন্ধে আমি এ কথাও বলেছিলাম যে ওই সমস্ত কেন্দ্রে সেবার যা ঘটেছিল তার পর ১৯৭২ সালের নির্বাচনের সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার সিপিআই(এম)-এর থাকে কিনা তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তোলা যায়। কর্মসূত্রে আমি উড়িষ্যার রাউরকেল্লা নিবাসী, অন্যদিকে পার্থসারথি রাজনৈতিক কাজের সূত্রে পশ্চিমঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেরিয়েছেন সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। গ্রামে ভোটদাতাদের কীভাবে সন্ত্রস্ত করে রাখা হয় তার বেশ কিছু উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। সে সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু ১৯৮২ থেকে ভোটদানের হার বেড়ে যাওয়া সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা আমার ধারণা সঠিক নয়। ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রদত্ত ভোটের হার সব সময়ই বেশি ছিল। পার্থসারথি নিজেই জানিয়েছেন যে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৬৬% ভোট পড়েছিল, সেবার সমগ্র ভারতবর্ষে প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ কিন্তু ছিল ৬০%-এর নীচে। তাছাড়া কলকাতায় একটি পত্রিকায় স্বনামধন্য প্রাক্তন সম্পাদক (তিনি আজ জীবিত নেই বলে তার নাম উল্লেখ করছি না) বামফ্রন্টের রিগিং এর প্রমাণ দিতে বার বার এ কথাই বলতেন যে এ রাজ্যে এত বেশি ভোট পড়াটা শাসক-দলের পেশী-শক্তি প্রকাশের পরিচায়ক। তিনি আরও বলেছিলেন যে কলকাতায় যেখানে ৬৫% বেশি ভোট পড়ে না সেখানে গ্রামাঞ্চলে কোন কোন এলাকায় ৮০% এর বেশি ভোট পড়ে কী করে? এখানে বলা প্রয়োজন সাম্প্রতিক যে-দুটি নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভরাড়ুবি হলো সেই চতুর্দ্দশ লোকসভা (২০০৯) এবং রাজ্য বিধানসভার পঞ্চদশ (২০১১) নির্বাচনে এ রাজ্যে প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ ৮০% ছাড়িয়ে গিয়েছে। দু'বারই কলকাতার প্রদত্ত ভোটের হার সমগ্র রাজ্যের তুলনায় ছিল অনেক কম। যেমন এই বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে সমগ্র রাজ্যে ভোটদানের হার প্রায় ৮৫% সেখানে কলকাতায় ভোট পড়েছে মাত্র ৬৫%। সুতরাং এই পত্রলেখকের ধারণা, প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ থেকে পার্থসারথি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা সম্ভবত ঠিক নয়।

আলোচ্য নিবন্ধ সম্পর্কে আর একটি কথা বলে এই পত্র শেষ করব। নির্বাচনে অসাধু উপায় অবলম্বনের উদাহরণ হিসাবে পার্থসারথি জাল ভোট প্রদানের যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তিনি বিষয়টি এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যার থেকে মনে হতে পারে শুধুমাত্র সংসদীয় বামপন্থী দলগুলিই এই অপরাধে অপরাধী। পার্থসারথি ১৯৬৭ সালের উদাহরণ দিয়েছেন, আমি আরও দশ বছর আগের অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের একটি ঘটনার কথা এখানে জানাচ্ছি সেবার বিধান রায় মন্ত্রিসভার এক ডাকসাইটে মন্ত্রী নির্বাচনের ২ দিন আগে ব্যাংক থেকে ৮০,০০০ টাকা তুলেছিলেন শুধুমাত্র ২ টাকা এবং ৫ টাকার নোটে। পরে বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা প্রয়াত জ্যোতি বসু এই নিয়ে প্রশ্ন করলে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ওই মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার— এই মন্তব্য করে সরকার পক্ষ বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যান। তারা কেন বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই 'মন্ত্রী-মহোদয়' নির্বাচনের ঠিক আগে কেন শুধুমাত্র দুই এবং পাঁচ টাকার নোটে অতগুলো টাকা তুলেছিলেন তা আশা করি সকলেই বুঝতে পারবেন।

সুদীপ্ত সেন

লেখকের উত্তর

সুদীপ্ত সেনের চিঠি পড়ে ভালো লাগলো। এবারের অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বামফ্রন্ট আমলে ভোটদানের পরিমাণ একলাফে বেড়ে যাওয়া (১৯৭৭ সালে ৫৬ শতাংশ থেকে ১৯৮২ সালে প্রায় ৭৭ শতাংশ) নিয়ে আমার যুক্তি প্রশ্নের মুখে পড়বে, এটা আমি ভাবছিলামই। আমার বক্তব্য ছিল, বামফ্রন্ট আমলে গ্রামাঞ্চলে যেভাবে ভোট দেওয়ার হার বেড়েছে, তার পেছনে কাজ করছে মূলত তৎকালীন শাসক দলের পক্ষ থেকে গ্রামীণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই নির্দেশিকা যে, সবাইকে ভোট দিতে হবে, এবং সেটা শাসকদলকেই দিতে হবে। এই অনুশাসন অন্তত

এর পর ৩৯ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ফিরে দেখা :প্যাট্রিস লুমুম্বা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নিহত হয়েছিলেন আফ্রিকার দেশ কঙ্গোর দেশপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা। তাঁর 'অপরাধ' ছিল এটাই যে, তিনি ছিলেন আত্মোৎসর্গকারী অক্লান্ত ও আবেগ-ঋদ্ধ এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্যান-অ্যাফ্রিক্যান কঙ্গোনিজ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক; তাঁর দেশের ব্যাপক মানুষের সমর্থনে তিনি কঙ্গো থেকে উত্তাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণকারী বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের কঙ্গোকে নয়াউপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তাই তারা চক্রান্তের জাল বুনে তাঁকে হত্যা করেছিল।

১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত কঙ্গোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিলো সেদেশের মধ্যশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে। ঔপনিবেশিক বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে তাদের ছিল স্বার্থের বন্ধন। ফলত তারা স্বাধীনতা দাবি করলেও সাম্রাজ্যবাদীদের পুরোপুরি উৎখাত করা তাদের ঈপ্সিত ছিল না। অন্য দিকে তারাই আবার সেদেশের কৃষক-শ্রমিক জনতার জঙ্গি লড়াইয়ের ভয়ে ভীত ছিল। আর লুমুম্বা ছিলেন কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধি— ১৯৫৫-র পরবর্তীকালে গণসংগ্রামের উত্তাল জোয়ার তুলে দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করতে থাকেন। পরিস্থিতি ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিকূলে চলে যেতে শুরু করলে, তারা প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে কঙ্গোতে নয়াঔপনিবেশিক পন্থায় পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চক্রান্ত শুরু করে। কঙ্গো স্বাধীনতা পেলেও তাদের উপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত থাকবে— এই প্রত্যাশায় ১৯৬০-এর ৩০ জুন তারা কঙ্গোকে স্বাধীনতা দিয়েছিল, কিন্তু লুমুম্বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে প্রথম থেকেই তাদের শর্তাধীন সহযোগিতাকে প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর পথে দেশকে পরিচালনা করতে থাকেন। তখন থেকেই বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিন সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় দেশের ভেতরে বিভিন্নভাবে গণ্ডগোল ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবার চক্রান্ত শুরু করে। তাদের তাঁবেদার দালালদের উস্কে দিয়ে কঙ্গোর কাতাঙ্গা ও কাসাই প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং স্বাধীনতার তিন মাসের মধ্যে ১৪ জুন সিআইএ-র চক্রান্তে সামরিক অভ্যুত্থানে লুমুম্বা ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী হন। কয়েক দিনের মধ্যেই নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়।

সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ভারতেও ছাত্র-যুবকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। সে সময় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এই ঘটনা বিশেষ ভূমিকা নেয়। চে গুয়েভারা তখন বলেছিলেন : *সাম্রাজ্যবাদের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের প্রহরা কখনও শিথিল করলে চলবে না— লুমুম্বার মৃত্যু আমাদের সবার কাছেই একটি শিক্ষা হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের আরও আরও সচেতন করে তুলবে।*

আজ যখন সাম্রাজ্যবাদীরা সারা পৃথিবীকে নতুন নতুন পন্থায় করায়ত্ত করে ফেলছে, তখন লুমুম্বা-র অসমসাহসিক সংগ্রামী চেতনা আমাদের সামনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা '*আফ্রিকার বুকে একটি সকাল*' পুনর্মুদ্রিত হলো।

আফ্রিকার বুকে একটি সকাল

প্যাট্রিস লুমুম্বা

অনুবাদ: সরোজ দত্ত

নিগ্রো, তুমি হাজার বছর ধরে অত্যাচার সয়েছো পশুর মতো
আর মরুভূমির বাতাসে উড়েছে তোমার ভস্মশেষ
তোমার আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার নামে
তোমার দুঃখভোগকে জিইয়ে রাখার জন্য
মুষ্ট্যাঘাতের বর্বর অধিকার —
আর কশাঘাতের শ্বেতাঙ্গ অধিকারকে জিইয়ে রাখার জন্য,
তোমার মরার অধিকার
আর তোমার কান্নার অধিকারকে চিরন্তন করার জন্য,
তোমার জালিমেরা গড়েছে অসংখ্য অনিন্দ্যসুন্দর জাদুমন্দির;
তোমার টোটেমের বুকে ওরা এঁকে দিয়েছে
অন্তহীন উপবাস ও অন্তহীন বন্ধন।
অরণ্যের অন্তরীক্ষ থেকে সাপের মতো লক্ষ্য করেছে তোমাকে
এক বীভৎস নিষ্ঠুর মৃত্যু —
বনস্পতির ফাটল, ফোকর ও শীর্ষদেশ থেকে
প্রসারিত শাখার মতো পাকে পাকে জড়িয়েছে
তোমার দেহকে তোমার পীড়িত আত্মাকে ।
তারপর তোমার বুকের উপর ছেড়ে দিয়েছে
এক বিরাট কুটিল বিষধর;
কাঁধে দিয়েছে ফুটন্ত জলের জোয়াল,
সস্তা ঝুটো মুক্তোর ঝলকানিতে প্রলুব্ধ করে
বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে তোমার প্রেয়সীকে —
কেড়ে নিয়েছে তোমার অবিশ্বাস্য অপরিমেয় ঐশ্বর্যকে।
অন্ধকার নিশীথে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

তোমার কুটির থেকে উঠেছে টমটমের আওয়াজ,
ভেসে এসেছে ধর্ষিতা নারীর আর্ত চিৎকার,
তোমার বিশাল কালো নদ-নদীর বুক বেয়ে
অশ্রু আর রক্তের সমুদ্র বেয়ে
বোঝাই জাহাজ চলেছে সেই পাপভূমির দিকে —
ওরা যাকে বলে 'মাতৃভূমি'
মানুষ যেখানে পঙ্কিল
ডলার যেখানে সম্রাট।
যেখানে তোমার সন্তান, তোমার প্রেয়সী
দিনে দিনে পিষ্ট হয়েছে
নির্মম ও ভীষণ শোষণের রথের চাকায়,
অসহায় যন্ত্রণায়।
ওরা তোমাকে বুঝিয়েছে
সবার মতো তুমিও মানুষ,
শ্বেতাঙ্গ দেবতা একদিন সব মানুষকেই মেলাবেন।
কিন্তু কান্না তোমার থামে নি কোনো দিন —
কান্নার গান গেয়ে ফিরেছো তুমি অনাত্মীয়ের দ্বারে দ্বারে
গৃহহীন ভিখারীর মতো।

যখন জ্বালার জোয়ার লেগেছে দেহে মনে
সারা রাত ধরে নেচেছো তুমি
আর গান গেয়েছো ঝড়ের গোঙানির মতো,
হাজার বছরের যন্ত্রণার গর্ভ থেকে
ফেটে পড়েছে প্রচণ্ড এক শক্তি
পৌরুষের সুরের আগুন লাগা কথা ও কাহিনীতে
জাজ সংগীতের ধাতব ঝংকারে।
সেই উন্মাদিনী সুরধুনীর মুক্তধারার বেগের প্রচণ্ডতায়
কেঁপে কেঁপে উঠেছে মহাদেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত;
চমকে জেগে উঠেছে সারা দুনিয়া।
সেই ভীষণ রক্তের ছন্দ
সেই ভীষণ ছন্দ সঙ্গীতের
আতঙ্কে বিবর্ণ শ্বেতাঙ্গের দল কান পেতে শুনেছে
নিশীথ অন্ধকারে জ্বলন্ত মশালের মতো —
এক নতুন গান।

সকাল হয়েছে বন্ধু,
চেয়ে দ্যাখো আমাদের মুখের দিকে—
জ্বল্ জ্বল্ করছে এক নতুন সকাল।
চেয়ে দ্যাখো, পুরোনো আফ্রিকার বুকের উপর
ভেঙে পড়ছে এক নতুন সকাল।
এতোদিনে ফিরে পাবে সর্বহারা নিগ্রো তার
হাজার বছরের হারানো দেশ,
হারানো জমি, হারানো জল,
হারানো বিশাল নদ-নদী।
সূর্য উঠেছে; তার বিকীর্ণ নির্মম অগ্নিকণায়
শুকিয়ে যাবে তোমার মুখের উপর ছিটানো থুতু—
শেকল ছেঁড়ো বন্ধু, শেকল ছেঁড়ো।
শেকল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে
চিরদিনের মতো সাঙ্গ হবে তোমার
দুঃসহ দুঃখের দারুণ দুর্দিন।
কালো মাটির বুক চিরে মাথা তুলে দাঁড়াবে
এক স্বাধীন নির্ভীক কঙ্গো।
কালো মাটির অন্ধকারে কালো বীজের ভেতর থেকে
কালো মুকুলে মঞ্জরিত হয়ে
আলোর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে
কঙ্গো, আমার কঙ্গো।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এবং জনমতের প্রতিফলন

৩৭ পৃষ্ঠায় পর

দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে চালু ছিল। এবারের নির্বাচনেও আমি কলকাতায় কাজ করতে আসা অত্যন্ত দরিদ্র গ্রামের লোকের সাথে কথা বলে দেখেছি, তাদেরকেও তিন দিন ছুটি নিয়ে বেশ খানিক পয়সা খরচ করে গ্রামে ভোট দিতে যেতেই হবে। কেন ভোট দিতে যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পেয়েছি, ভোট দিতে না গেলে পার্টির বাবুরা রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করে নেবে। এরকম ঘটনা অতীতে ঘটেছে বলেই ভোট দিতে তাদের এই তৎপরতা। এমন ঘটনা বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়নি। সিপিএম প্রভাবাধীন এলাকাতে যেমন এই অনুশাসন সিপিএম জারি করে, তেমনি জানলাম এসইউসি প্রভাবিত জয়নগরে একই অনুশাসন গরিব মানুষের ওপরে বিরোধী পক্ষে থাকা এই দলটি জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ভোট প্রদানের পেছনে এই অনুশাসন বড়ো ভূমিকা নেয় বলে আমার মনে হয়েছে। একেবারে ভয়মুক্ত কোনো নির্বাচন এ রাজ্যে বা অন্য কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই।

দ্বিতীয় যে সংশয় সুদীপ্ত তুলেছেন, সেটা আমার লেখাটা ভালোভাবে পড়লেই নিরসন হবে বলে মনে হয়। দেখুন আমি লিখেছিলাম, "ছাপ্পা ভোট কংগ্রেসের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল না।" আমি শুধুমাত্র বামপন্থীদের এ ব্যাপারে দায়ী করিনি। বরং বামপন্থীরা যে সেই ১৯৬৭ সাল থেকে ছাপ্পা ভোট দেওয়ায় হাত পাকিয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলাম।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

❑ কৃচ্ছ্রসাধন শুধু গরীবদের জন্য?

অভিধান অনুসারে, 'কৃচ্ছ্রসাধন' কথাটির অর্থ 'বিশেষ কষ্ট সহ্য করা'। কিন্তু মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর অভিধানে— শুধু মার্কিন কেন, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের শাসকগোষ্ঠীরই অভিধানে— অর্থটি একটু সংকীর্ণতর: 'শুধু গরীবদের বিশেষ কষ্ট সহ্য করা'— বড়োলোকদের নয়। একটু তথ্য দিলেই এর প্রমাণ মিলে যাবে। ২০০৮-এ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ১৯২৯-পরবর্তী সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক সংকটের শুরুর তুলনায় গত তিন বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গরীব মানুষদের বেকারত্ব, মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে ক্রমাগত কমে গেলেও, এই সময়কালে বিশ্বায়নের কর্মসূচির কৃপায় বড়োলোকদের ('high net worth individuals' বা HNWIs সম্পত্তিজাত ও অন্যান্য নিয়মিত আয় বাদ দিয়েই যাদের হাতে সবসময় শুধুমাত্র হাতখরচের জন্য অন্তত এক মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ সাড়ে চার কোটি টাকা থাকে) আয়, সম্পদ ও সংখ্যা কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে । এদের মোট আয় বেড়েছে ৪০.৭ কোটি থেকে ৪২.৭ লক্ষ কোটি ডলার— ৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি। আর এদের সংখ্যাটা বেড়েছে ৮.৩ শতাংশ। আর অতি বড়োলোকদের (যাদের হাতে সবসময় শুধুমাত্র হাতখরচের জন্য থাকে অন্তত ৩০ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ১৪০ কোটি টাকা) মোট আয় বেড়েছে ১১.৫ শতাংশ। এই মুহূর্তে আয়ের হিসেবে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি আয়-বিশিষ্ট এক শতাংশ লোক দুনিয়ার মোট ব্যক্তিগত সম্পত্তির ৩৬ শতাংশের মালিক হতে পেরেছে। ভারতে এই HNWI-দের সংখ্যা এই সময়কালেই ২০.৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ ৫৩ হাজার। সংখ্যাটা এতো বেশি কোনো দেশেই বাড়ে নি। উল্লেখ্য যে, আইএমএফ-এর হিসেবে, মাথা পিছু আয়ের বিচারে ভারত রয়েছে ১৩৮ নম্বর স্থানে, আর রাষ্ট্রসংঘের হিসেবে, মানব উন্নয়ন সূচকের (গড় আয়ু, শিক্ষা ইত্যাদিরও নিরিখে) রয়েছে ১১৯ নম্বর স্থানে। ভারতের ডান-বাম-নির্বিশেষে সমস্ত সংসদীয় দল কার্যত কেন বিশ্বায়নের পথিক হতে আগ্রহী, নিশ্চয়ই সেটা আর ব্যাখ্যার দরকার নেই!

❑ **তথ্যসূত্র:** Merrill Lynch and Capgemini— *The Annual World Wealth Report*, 2011

একুশ শতকের 'প্রশ্ন'

রাজেশ দত্ত

আমেরিকা তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে
এই ভারতের দ্বারে...
তারা বলে গেল,'কাঁচামাল দাও',
বলে গেল, 'খোলো বাজার...'
বেগার খাটিতে গরিব মজুর জোগাও হাজার হাজার।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, বরণ করিনু হেসে,
উদারীকরণে বাঁধিলাম দেশ পরাধীনতার পাশে।

আমি যে দেখেছি, লাভের পাহাড়ে কর্পোরটরা চড়ে,
ভুখা মানুষের শবের উপরে কলকারখানা গড়ে।
আমি যে দেখেছি— লুঠ হয়ে যায় জল-জঙ্গল-জমি,
বিদেশি প্রভুর স্বদেশি দালাল বেচিল জন্মভূমি।
আমি যে দেখিনু, বর্বর লোভ ও রাষ্ট্রের সন্ত্রাস...
বিচারের বাণী কাঁদে না নিভৃতে, বিচার পুঁজির দাস।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ করতে কালা কানুন জারি,
প্রতিবাদে মানুষ মুখর হলে দুই হাতে হাতকড়ি।
বন্দী করবে লোহার গারদে 'দেশদ্রোহী' বলে।
প্রশ্ন কোরো না, জবাব পাবে না ভাসিলে অশ্রুজলে।

শান্তির বাণী পরিহাস আজ, পৃথিবী দস্যুভোগ্য,
হিংসায় উন্মত্ত রাষ্ট্র, চলছে মারণযজ্ঞ।
যাহারা তোমার বিষাইয়ে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তাদের রুখতে হাতে হাত রেখে ব্যারিকেড গড়ে তোলো।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

à±ŏÉUÑ3ÂóÂ

বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে • সম্মানের সঙ্গে উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন ও বামপন্থার ভবিষ্যৎ

পাঠকের কলমে • লুমুম্বা স্মরণে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

চালংচ ।প [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

।ভাকলক p গঙ্গি কাৎ ,A [redacted]

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

[redacted]

[illegible]

[redacted]

[illegible] [redacted]

[illegible] [redacted]

[illegible]

[illegible]

[redacted] [illegible]

[redacted]

[illegible] [redacted] [illegible]

[illegible] [redacted] [illegible]

[illegible] [redacted] [illegible]

[illegible]

[redacted] [illegible]

[illegible]

[illegible] [redacted]

[redacted]

[illegible] [redacted]

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

POSTAL REGN. NO. : WB / BRS / RNP-105 / 2007-09 R.N.I REGN. NO. : 12026/65

ANEEK q 48TH YEAR : 1ST ISSUE q JULY 2011 q RUPEES FIFTEEN ONLY

অনীক

আগস্ট ২০১১

সম্ভাব্য সূচি

q **পরমাণু শক্তির বিকল্প** (সুজয় বসু)

q **পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস : সালতামামি**

q **প্রসঙ্গ উৎপল দত্ত** (বিভাস চক্রবর্তী)

q **গোধরা মামলার রায়**

প্রকাশিত হবে আগস্ট-এর মাঝামাঝি

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়, অনীক-এর ঠিকানায় গ্রাহক চাঁদা পাঠাবেন। চেক পাঠাতে হবে ANEEK নামে।
অবশ্যই সম্পূর্ণ ঠিকানা পাঠাবেন। কোন্ সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে চান জানাবেন।
ফোন নং এবং ই-মেল জানালে ভালো হয়।
গ্রাহক সম্পর্কিত যে কোন প্রয়োজনে ফোন করবেন :
৯৮৩০১৪৩৩৬৫ / ৯৪৩৩৭২৪৪৬২

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

অনীক : যোগাযোগের ঠিকানা পাল্টে গেছে

অনীক। প্রযত্নে : পিপলস্ বুক সোসাইটি। ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট।
কলকাতা - ৭০০ ০০৯ (*ফোন :* ০৩৩-২২১৯-৯২৫৬)

দীপংকর চক্রবর্তী (স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com